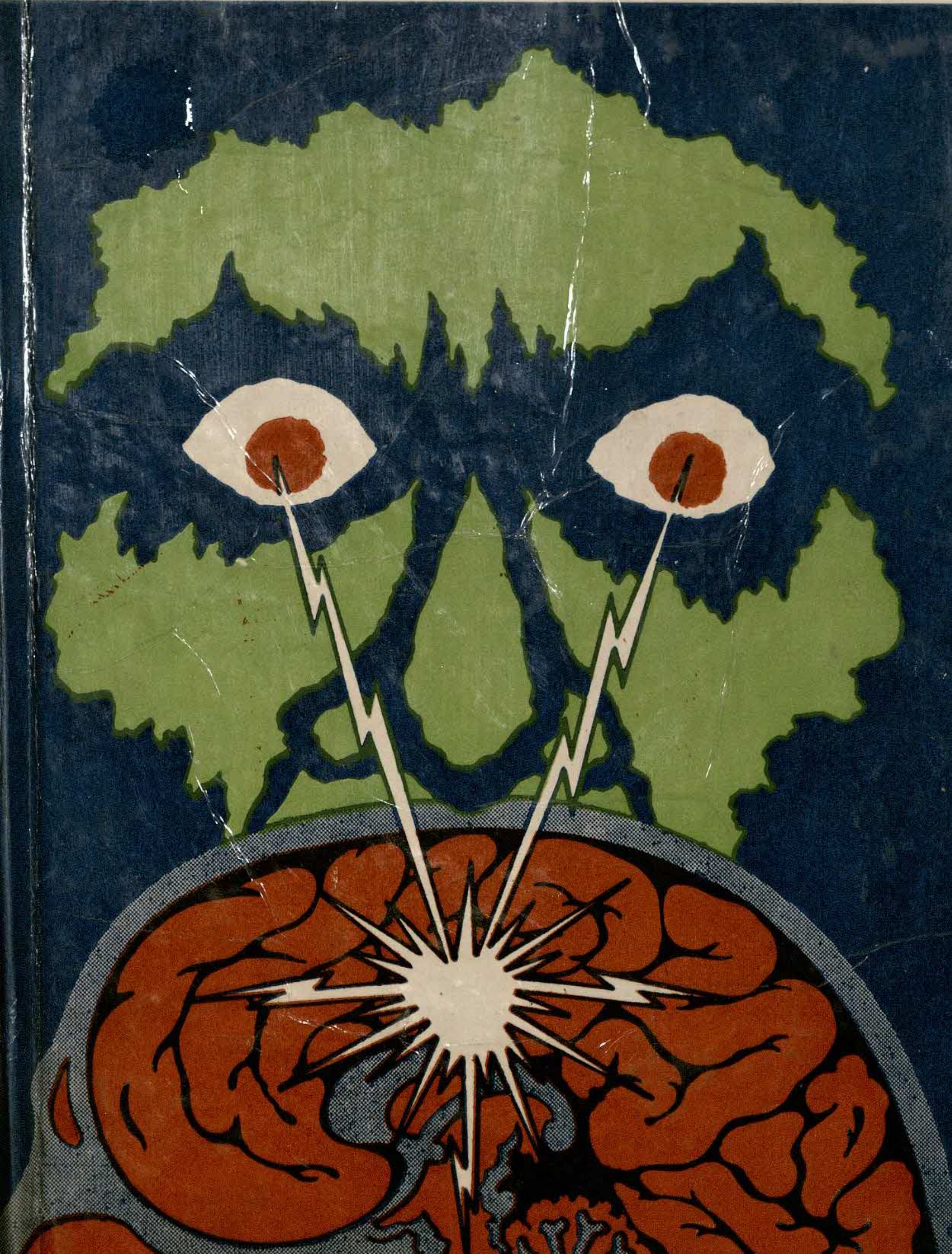
সুকুমার ভট্টাচার্য

ব্রেন কন্ট্রোল



ব্রেন কণ্ট্রোল

সুকুমার ভট্টাচার্য্য

বিভা এণ্টারপ্রাইজ
কলিকাতা-৬৫

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৯৫

প্রচ্ছদ : অঞ্জন ঘোষ

মূল্য : সাত টাকা মাত্র

বিভা এণ্টারপ্রাইজ-এর পক্ষে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী কর্তৃক
প্রকাশিত ও স্টার প্রিন্টিং প্রেস, ২১এ, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

আজগবি

শ্রীযুক্ত আ যখন চোখ খুললেন, ঘরে তখন কেউ নেই। প্রথমেই চোখ পড়ল সিলিং ফ্যানটায়। বন বন করে ঘুরছে। শোয়া অবস্থাতেই মাথাটা ঘোরালেন এদিক ওদিক। ঘরটার এককোনে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার চোখে পড়ল। তার পাশে ছোট একটা টেবিল। ওপরে সাজানো রাজ্যের ওষুধপত্তর। তাছাড়া কিরকম একটা উগ্র গন্ধ নাকে এসে লাগল। এমন গন্ধ সাধারণতঃ হাসপাতাল কিংবা নার্সিং হোমে পাওয়া যায়।

তাহলে কি আমি হাসপাতালে? ভাবলেন শ্রীযুক্ত আ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সব কিছু। মোটর বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ি। গাড়িয়ায়। টালিগঞ্জ পেরোবার পর গতির নেশায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে। দ্রুত ছুটে চলার আনন্দ। কিন্তু কিছু পরেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন তিনি। ঝটিতি ব্রেক কষতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা স্টেট বাসের ওপর। তার পরেই একটা অন্ধকার পর্দা নেমে এসেছিল চোখের ওপর। হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে শ্রীযুক্ত আ-এর।

মনের মধ্যে যখন সাত পাঁচ চলছে, সেই সময় একজন নার্স এসে ঘরে ঢুকলেন। গুটি গুটি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন বিছানার পাশে। শ্রীযুক্ত আ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুখ হাসলেন,—এই যে ঘুম ভেঙেছে দেখছি তাহলে? ডক্টর জ-কে খবরটা দিয়ে আসি।

পিছু ফিরতেই কানে এল,—শুনুন।

দাঁড়িয়ে গেলেন নার্স।

ডক্টর জ কে?——ক্লান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন শ্রীযুক্ত আ।

—তিনি একজন নামকরা সার্জন। আপনার অপারেশন তো তিনিই করেছেন।

—অপারেশন! আমার অপারেশন হয়েছে নাকি? কি অপারেশন? এক গাদা প্রশ্ন করলেন শ্রীযুক্ত আ। কিন্তু নার্সের অস্বচ্ছন্দ ভাব তাঁর নজর এড়ালো না।

—দেখুন, সে কথা আমার মুখে আর নাই বা শুনলেন। ডক্টর জ সব কিছুই জানাবেন আপনাকে।

—তবু এই মুহূর্তে যতটুকু জানেন বলতে আপত্তি আছে?

—মাপ করবেন নার্সের পক্ষে রুগীকে আগে ভাগে কিছু জানানো আইন বিরুদ্ধ। কিছু মনে করবেন না।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নার্স।

কৌতূহল মাথাচাড়া দিল। তাহলে তাঁর কি অপারেশন হয়েছে? নার্স অমন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন কেন? অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছু বাদ দিতে হয়েছে নাকি। আধশোয়া হয়ে উঠে বসলেন শ্রীযুক্ত আ। গায়ে হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু এ.ক, হাত পাগুলো যেন কেমন কেমন লাগছে। কেমন যেন রোগা রোগা লম্বা লম্বা। গায়ের চামড়াও যেন তেল তেলে। অতিরিক্ত মোলায়েম। তাড়াতাড়ি করে হাত দুটো গালের ওপর রাখলেন। ছোঁয়া মাত্রই অবাক হয়ে গেলেন। একি, তাঁর তো এমন ফোলা ফোলা মসৃণ গাল ছিল না! তবে কি তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফুলে গেছেন? তারপর দাঁতে হাত পড়তেই মনটা যেন পাথর হয়ে গেল। হাজার প্রশ্ন মাথার ভেতর উঁকি ঝুঁকি মারছে যখন, তখন দরজা ঠেলে এক প্রবীণ ভদ্রলোক কেবিনে ঢুকলেন।

সটান লম্বা দোহারা চেহারা। পরনের স্যুটটা বেশ দামী বলেই মনে হল। মাথা ভর্তি সাদা ধবধবে পাকা চুলের রাশ। চোখে কালো ফ্রেমের হাই-পাওয়ার লেন্স। শ্রীযুক্ত আ কিছু বলার আগেই তিনি এসে বসলেন বেডের পাশের টুলটায়।

—আমিই ডক্টর জ। তারপর এখন কেমন বোধ করছেন বলুন?

আমার ঠিক কি হয়েছিল?—সরাসরি প্রশ্ন করলেন শ্রীযুক্ত আ।

আপনি ঘুমুচ্ছিলেন।—একটু এড়িয়ে যাওয়ার ভাব ডক্টর জ এর।

—হুঁ। কিন্ত কতক্ষণ?

—মানে!

—কঘণ্টা?

—চোদ্দ দিনের মত।—একটু দ্বিধা ডক্টর জ এর গলায়।

—দু সপ্তা! বলছেন কি?

—হ্যাঁ। মেজর অপারেশন কিনা, তাই একটু বেশী সময় নিল। তবে

এ জাতীয় অপারেশনে একমাত্র আপনার ওপরেই আমরা সাক্‌সেসফুল হলাম।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর আবার শুরু করলেন,—অবশ্য অপারেশনের ব্যাপারে সব কিছুই আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য। তবে কথা কি, তার আগে আপনার মানসিক অবস্থাটা একবার যাচাই করে নেওয়া দরকার।

অর্থাৎ? –বিরক্তি শ্রীযুক্ত আ এর গলায়।

—সত্যি কথা হঠাৎ শোনার একটা মানসিক ধকল আছে জানেন তো? অতএব, আপনি কি ভেবে নেবেন, সেটাই চিন্তা করছি। তবে সবার আগে ভগবানকে ধন্যবাদ দিন যে, আপনি বেঁচে আছেন।

উঠে পড়লেন ডক্টর জ। পায়চারি করতে লাগলেন কেবিনের ভেতর।

আমার ঠিক কি অপারেশন হয়েছে?

বলছি-বলছি।—পায়চারি করতে করতেই ডক্টর জ বললেন, আসলে আপনার সব কিছুই অপারেশন করে বাদ দিতে হয়েছে।

কি-কি বলছেন আপনি? তোত্‌লা হয়ে যান শ্রীযুক্ত আ।

—ধৈর্য হারাবেন না। আপনার চোখ দেখে মনে হয়, সহজে ঘাবড়ে যাবার মানুষ আপনি নন। ভাল কথা, একটু গরম দুধ যদি খান—খুব খারাপ লাগবে কি?

যাচ্ছেতাই। আপনি কি আমাকে নিয়ে খেলা শুরু করছেন?—শ্রীযুক্ত আ রূঢ় না হয়ে পারলেন না।

—মোটেই না। খেলাধুলো জিনিষটা ভাল, তবে সব সময়ে সেটা চলে না।

—আশ্বস্ত হলাম। এবার আসল কথায় আসবেন কি?

—হ্যাঁ, এবার আসতে হবে বৈকি। বিশেষ করে না এসে যখন উপায় নেই।

টুলটার ওপর আবার এসে বসলেন ডক্টর জ। চোখের ওপর থেকে চশমাটা নামিয়ে রুমালের কোনা দিয়ে মুছতে লাগলেন।

– হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—আপনি এখন যেখানে আছেন, এটা হল একটা গোপন নার্সিং হোম। এখানে সাধারণতঃ আমরা Transplant Surgery'র কাজকর্ম করে থাকি। যেমন ধরুন হার্ট, কিডনী, লিভার, মাংস, শরীরের এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের অদল বদল করে থাকি। শহরের রাস্তায় বলতে গেলে এমন কত মানুষ হাঁটছেন, যাঁর দেহটা নিজের কিন্তু

লাংসটা অন্যের।

কি করে সম্ভব?—ভাল করে উঠে বসার চেষ্টা করেন শ্রীযুক্ত আ।

—অসম্ভব কিসে? মনে করুন লিভার খারাপ হওয়ার দরুণ কোন মানুষ মারা গেছেন, আর ঠিক সেই সময়েই আর একজন মানুষ মারা যেতে বসেছেন হার্ট খারাপথাকার দরুণ। এখন মৃত ব্যক্তির হার্টটা নিয়েযদি মৃতপ্রায় ব্যক্তির শরীরে ঠিক ঠিক লাগিয়ে দেওয়া যায়,—তাহলে অসুবিধে কোথায়?

—এমন হয়?

—হয়না আবার! ক-ত্তো হয়। শহরে এই যে এত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা সবাই স্বাভাবিক শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি? অন্ততঃ একটা ভাল পার্সেন্টেজ এই শহরে আছেন, যাঁরা অপরের শরীরের কোন না কোন অংশ নিজেদের শরীরে লাগিয়ে নিজেদের কর্মক্ষম রেখেছেন। কারুর লিভার, কারুর লাংস, কারুর বা হার্ট। কেউ কেউ বা আগে অন্ধ ছিলেন, এখন অপরের চোখ পেয়ে নিজের মতন দেখছেন। এতে অবাক হবার কি আছে? আসলে কথা হল, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে মেডিক্যাল সায়েন্স এগিয়ে চলেছে—তার সামনে এগুলো কোন প্রবলেমই নয়। আশা করি, আমি যা বলতে চাই তার কিছুটা অন্ততঃ বোঝাতে পেরেছি।

শ্রীযুক্ত আ-এর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকালেন ডক্টর জ। কিন্তু তার মুখ তখন ফ্যাকাসে। কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলেন, বটে—একটা কথা বলুন তো, এই হাত দুটো কি আমার?

—হ্যাঁ, এখন ও দু'টো আপনার-ই।

মানে! দম বন্ধ হয়ে আসার দশা শ্রীযুক্ত আ-এর।

আগে আপনার ছিল না, এখন আপনার।—আশ্বস্ত করতে চান ডক্টর জ।

—তাহলে আগে এ দুটো অন্য কারুর ছিল?

—অবশ্যই। তবে এখন তাতে কি যায় আসে? এখন ও দু'টো আপনারই, আর আপনার ইচ্ছামত যথাযথ নড়াচড়া করবে।

শ্রীযুক্ত আ তখন হাত দুটোকে নাড়াচাড়া করে দেখছিলেন। দুর্ঘটনার আগের হাত দুটোর সঙ্গে কোন মিল নেই। সেগুলোর থেকে এগুলো অনেক কোমল ধরনের আর ফরসা। ডক্টর জ-এর কথায় আবার মুখ তুললেন ভদ্রলোক।

—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন কি? শরীরের যা কিছু আপনি দেখবেন, সবই নতুন আপনার কাছে। আসলে দুর্ঘটনার পর যে অবস্থায় এখানে পৌঁছেছিলেন, তখন আর দেহটার কিছুই আস্ত ছিল না। একেবারে মেরামতের বাইরে। খুব বরাতের জোর যে এখানে এসে পড়েছিলেন, নইলে আর নিজেকে ফেরত পেতেন না।

—আমি কি একটা আয়না পেতে পারি? আপনার এত কথা শোনার পর আর ভরসা পাচ্ছি না কোন দিক থেকে।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ডক্টর জ উঠে পড়লেন। টেবিলের ওপর থেকে একটা আয়না এনে হাতে তুলে দিলেন। আয়নাতে মুখ দেখেই শ্রীযুক্ত আ চীৎকার করে উঠলেন, না না, এ আমি নয়, এ কে?

বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না ডক্টর জ। মৃদু হেসে শান্ত ভাবে বললেন,—এই চেহারাটাই এখন সত্যিকারের আপনার।

—না, তা হয়না। হতে পারে না।

—খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাই-ই হয়েছে। সব কথা শুনলে বুঝতে পারবেন। আমাদের নার্সিংহোমের কোল্ড মর্গে এই বডিটা আপনার মত কোন মানুষের অপেক্ষায় অনেকদিন পড়েছিল। আপনি এখানে আসতে এটা আবার চালু হবার সুযোগ পেল। এটি যাঁর দেহ, সে ভদ্রলোকের ছিল ব্রেন ইনজুরি। এবং সেটা এতই সিরিয়াস যে আমরা তাঁকে টিঁকিয়ে রাখতে পারিনি। তারপর আপনি এলেন, দেখলাম, দুর্ঘটনার পর দেহ বা কাঠামো বলতে আপনার আর কিছুই নেই। ভেঙেচুরে সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে। কিন্তু আপনার ব্রেন? যাকে বলে সম্পূর্ণ আন হার্ট। একেবারে অটুট। তখন আপনার বিকৃত দেহ থেকে ব্রেনটা বার করে নিয়ে এই সুন্দর কাঠামোয়, আই মীন দেহে রিপ্লেস করে দিলাম। যে কারণে আপনি আপনার তখনকার চোখ নিয়ে, এখনকার আপনাকে চিনে উঠতে পারছেন না।

জলের মত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন ডক্টর জ। আর শুনতে শুনতে রাগ ক্ষোভ বিরক্তিতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন শ্রীযুক্ত আ। ডক্টর জ-এর কথা শেষ হতেই একেবারে ফেটে পড়লেন,—যাচ্ছেতাই কথাবার্তা! কে আপনাকে অধিকার দিয়েছিল আমাকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলার? আপনি সার্জন হতে পারেন, কিন্তু যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন কি?

কারেক্ট ! কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন শ্রীযুক্ত আ,—শান্ত ভাবে বলে চললেন ডক্টর জঃ সে সময় পারমিশন দেবার মত অবস্থায় আপনি ছিলেন না। আর আপনার রক্ত ভেজা জামা কাপড় হাতড়েও, আপনার নিজের বা কোন আত্মীয় স্বজনের ঠিকানাও পাওয়া যায়নি। কার কাছ থেকে পারমিশন নেবো ?

—যাচ্ছেতাই ব্যাপার। তাই বলে এমন টাক মাথা হয়ে আমায় থাকতে হবে ? জানেন, আমার কি সুন্দর কোঁচকানো একমাথা চুল ছিল ?

—থাকতে পারে। কিন্তু লাভকি আপনার কিছুই হয়নি ? আমার বেশ মনে পড়ছে, আপনার দুপাটি বাঁধানো দাঁত ছিল,—তার জায়গায় এখন আপনার মৌলিক দাঁত। আই মীন ইট ইজ অরিজিনাল।

—ছাই ! ওপর নীচে মুলোর মত বেরিয়ে আছে। আগেকার দাঁতগুলো বাঁধানো হতে পারে, কিন্তু দুপাটি সুন্দর ভাবে সাজানো ছিল।

বুঝতে পারছি শ্রীযুক্ত আ, আপনার অসুবিধে কোথায়। কিন্তু এখন সব কিছু মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কি ? সান্ত্বনার সুরে কথা কটি বললেন ডক্টর জ।

—আপনি তো তখন থেকে শুধু মেনে নিতেই বলছেন ? কিন্তু যে আমি মারা গেছি, তার পক্ষে এই কাঠামোটা মেনে নেওয়া কষ্টকর নয় কি ?

—ফাণ্ডামেন্টালি এই খানেই তো আপনি ভুল করছেন। আপনি কখনও মরেননি, বরং বেঁচে আছেন। ভাল করে বুঝিয়ে বলছি শুনুন,—শরীরের মধ্যে ব্রেন একটা আসল যন্ত্র। এই ব্রেন থেকেই মানুষের শিক্ষা দীক্ষা আচার আচরণ জেনারেটেড হয়। এখন সেই অরিজিনাল ব্রেনটাই যখন বজায় আছে, তখন দেহটা বদলে গেছে বলে আপশোষ করাটা নেহাৎ বোকামি নয়কি ?

যাচ্ছে তাই কথা। অকস্মাৎ দেহটা বদলে যাওয়ার সমস্যাটা একবার ভেবে দেখেছেন ?—বলতে বলতে গলা ভেঙে এল শ্রীযুক্ত আ-এর। কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন,—আমি এখন কোথায় যাবো, কি করব বলতে পারেন ? আমার স্ত্রী আছেন আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁরা কি আমায় এই কাঠামোয় নিজের লোক বলে মনে করবেন ?

এবার আর তড়িঘড়ি জবাব বেরুল না ডক্টর জ-এর মুখ দিয়ে। একটা কথাই শুধু বার হল মুখ দিয়ে,—রিয়েলি, ইটস্ এ প্রবলেম।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যুক্তি ফিরে পেলেন তিনি,—হলই বা প্রবলেম, তাতে কি আছে ? প্রবলেম ছাড়া জীবন হয় না। বেঁচে থাকার হাজার

সমস্যার মধ্যে এটাকেও একটা প্রবলেম বলে ভেবে নিন। ঠিকই আপনার স্ত্রীর সংসারে ফিরে যাওয়ার অনেক অসুবিধে আছে কিন্তু কোন একটা নাম নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে তো কোন অসুবিধে নেই। জানবেন, যে কোন পরিস্থিতিকে সহজভাবে মেনে নিয়ে লড়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এরপর দুজনেই চুপচাপ। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল একটু একটু করে। কিছু পরে শ্রীযুক্ত আ বললেন,—কবে নাগাদ আমায় ছাড়া হবে এখান থেকে?

—মাস খানেকের আগে তো নিশ্চয় নয়। নতুন দেহটার সঙ্গে আপনার ব্রেন সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হোক। হাত পা-গুলোকে আপনার ব্রেন চালাতে শিখুক। নাক মুখ কানের নার্ভ-গুলোর ওপর কন্ট্রোল আসুক। আশা করছি এক মাসের মধ্যে এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। তখন আপনার ছুটি।

হুঁ। আচ্ছা আর একটা কথা, এই দেহটা যাঁর ছিল, তাঁর নামটা আমায় বলবেন কি?

—উঁহু। মাপ করবেন।

—যাচ্ছেতাই! কিন্তু জানেন, এর জন্যেও আমাকে প্রবলেম ফেস করতে হতে পারে?

পারে। নিশ্চয় পারে। তবে এটাও অন্য সব সমস্যার মত নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সামলে নিতে পারবেন বলে আশা করি। বলে উঠে পড়লেন ডক্টর জ। শ্রীযুক্ত আ-কে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে।

মাসখানেক পর শ্রীযুক্ত আ ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন ডক্টর জ-এর কাছ থেকে। ইতিমধ্যে নতুন দেহটা প্রায় সম্পূর্ণ বশে এসে গেছে। আর কোন অস্বস্তি নেই। বরং সত্যি বলতে কি, নতুন দেহটাকে একটু যেন ভালবেসে ফেলেছেন। আগেকার তুলনায় এটা অনেক ফর্সা আর তরুণ। যদিও সব কিছুর ওপর একটা ভয় কাজ করছে, কোথায় এখন যাবেন?

উপস্থিত সেটাই তাঁর প্রধান সমস্যা। ভবানীপুরের একটা ফ্ল্যাটে তাঁর ঘর সংসার বলতে কিছু আছে ঠিকই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার মত ভরসা পান না। শ্রীমতী গ অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী তাঁকে কি ভাবে নেবেন খুব সন্দেহ আছে। যদিও তিনি যথেষ্ট শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না, গভর্নমেণ্ট অফিসের একজন কর্মী। তবুও এসব ব্যাপারে উদারতা দাবী করা যায় না

কোন মতেই। তিনি যদি বিশ্বাস না করেন তো কিছুই বলার নেই শ্রীযুক্ত আ-এর।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন তিনি। সাত পাঁচ ভাবলেন অনেক কিছু। কোন কূলকিনারা পেলেন না। শেষ-পর্যন্ত তিতবিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীযুক্ত আ। যা থাকে কপালে, দেখাই যাক না চেষ্টা করে। হাজার হলেও সে ফ্ল্যাটের সব কিছু তাঁরই তো নিজের উপার্জনে করা। বাস ধরলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে নামলেন বাস স্টপেজে। বাকি পথটুকু হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ফ্ল্যাটের দরজায়। কলিং বেলে চাপ দেবার একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল আর শ্রীযুক্ত আ দেখলেন,—স্বয়ং শ্রীমতী গ সামনে দাঁড়িয়ে।

—কাকে চান ?

বিন্দুমাত্র ঘোরালো প্রশ্ন নয় তবু ভয় লাগল শ্রীযুক্ত আ-এর। বললেন, —আমি তোমার,—মানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। একটা গুরুতর ব্যাপারে কিছু বলার আছে।

অবাক শ্রীমতী গ। সেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যাবার পর অনেক ঝামেলা-ঝক্কিই তাকে পোয়াতে হয়েছে ঠিকই, তবু কোন অপরিচিত মানুষ এমন ভাবে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায় নি কখনো।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

—আমি,—আমি ধরুন কোন নার্সিং হোম থেকে আসছি।

—আপনি যদি সত্যিকারের কোন নার্সিং হোম থেকেই আসেন, তার মধ্যে ধরে নেবার অবকাশ কোথায় ? সোজা কথা বলুন, আপনি নার্সিং হোম থেকে আসছেন।

যাচ্ছেতাই। আচ্ছা, না হয় নার্সিং হোম থেকেই আসছি। কথা হল আপনার স্বামীর সম্বন্ধে কিছু খবর দেবার আছে।

থমকে গেলেন শ্রীমতী গ। টপ করে কোন জবাব বেরুল না মুখ দিয়ে। ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গি, হাত-নাড়া আর কথায় কথায় যাচ্ছেতাই বলা, অবিকল সেই নিখোঁজ মানুষটির মত। খুব সহজেই সেগুলি তার মনের নরম জায়গায় ঘা দিল। বললেন,—ভেতরে আসুন।

মনে মনে হাসলেন এবার শ্রীযুক্ত আ। ভেবেছিলেন শ্রীমতী গ-কে একটু কাহিল কাহিল দেখবেন। তা তো নয়ই, বরং বাঁকা কথা বলার ঝোঁকটা

আগের থেকে বেড়েছে! যাই হোক, এ মুহূর্তে সব কিছুই ভাল লাগছে। এই ঘরটায় কতদিন বসতে পান নি। আলমারীর বইগুলোয় হাত দিতে পারেন নি কতদিন। দেয়ালের ছবিগুলোয় এক পোঁচ নোংরা পড়েছে। সোফাটায় বসতে বসতে নজর পড়ল টি. ভি.-র ওপর। ঢাকনাটা লাগানো নেই। স্পষ্ট বিরক্তি এবার শ্রীযুক্ত আ-এর গলায়,—টি. ভি.-র কভারটা গেল কোথায়? ওটা ঢাকা দিয়ে রাখা ভাল কিন্তু। ধুলো বালি নোংরা থেকে অন্ততঃ বাঁচে জিনিসটা।

আবার একটা ধাক্কা খেলেন শ্রীমতী গ। অবিকল সেই এক স্বভাব। সব ব্যাপারেই খিটখিটে কথা। এ কোন্ মানুষ?

—হ্যাঁ, কি বলতে চান বলুন আমার স্বামীর সম্বন্ধে।

সামনের সোফায় বসে এবার শ্রীযুক্ত আ-এর মুখোমুখি হলেন তিনি।

—বলছি। তার আগে আপনি বলুন, তাঁর এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ব্যাপারে আপনার ধারণা কি?

—ধারণা তেমন কিছু স্পষ্ট নয়। হাসপাতাল, থানা সব জায়গাতেই খোঁজ করা হয়েছে। এমন কি কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছি, কিন্তু ফল হয় নি। কিন্তু কি জানি কেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

—কারণ?

কারণ,—একটু ইতিউতি ভাব দেখা গেল শ্রীমতী গ-এর গলায়, দেখুন আমি একটু জেদী ধরণের মানুষ, সেটা উনি আদপে পছন্দ করেন না। আর উনিও হলেন যথেষ্ট খিটখিটে মেজাজের। এ নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে খিটিমিটি লেগে থাকতো। যে কারণে আমার মনে হয়, তিনি হয়তো এমনি কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। এক সময় ঠিকই ফিরে আসবেন।

বেশ কিছুটা হাসি উপছে পড়ল শ্রীযুক্ত আ-এর মুখে। বললেন,—ফিরে আসবেন ঠিকই, কিন্তু আগেকার রূপে তাঁকে আর দেখতে পাবেন না।

—কেন সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী কিছু হয়ে গেছেন নাকি?

—উঁহুহু, সেসব কিছু নয়। দু-তিন দিনের মধ্যেই তিনি এসে যাবেন। তবে এই আসাটা আপনি কেমন ভাবে নেবেন, সেটাই একটা সমস্যা আপনার স্বামীর কাছে।

সমস্যার কি আছে?—শ্রীমতী গ-এর গলা বেশ নরম, ঘরের লোক ঘরে ফিরে আসবেন, এর থেকে ভাল কথা আর কি হতে পারে। আপনি তাঁকে

বলতে পারেন,—কি থাক, আমি নিজেই গিয়ে তাঁকে বলতে পারি,—আমি, তাঁর জন্যে দিন গুনছি।

কপট গাম্ভীর্যে মনের খুশি খুশি ভাবটা চেপে রেখে শ্রীযুক্ত আ বললেন: —ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার তো দেখা হবে না। আর তাঁর ঠিকানাও আমার জানা নেই যে, আপনাকে জানাবো।

তার মানে?—সন্দেহ ঘনিয়ে এল শ্রীমতী গ-এর চোখে।

—আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার এ বাড়িতেই দেখা হবে, এমনই কথা আছে। তিনি দুতিন দিন আমাকে এ বাড়ীতেই অপেক্ষা করতে বলেছেন। পরে তিনি এসে গেলে, আমার ছুটি।

—তা কি করে হবে? কিছু মনে করবেন না—

—যাচ্ছেতাই! আপনাদের সব কিছুতে অবিশ্বাস? কেন দুদিন এবাড়ীতে থাকতে দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

—তা যাবে না, কিন্তু—

কিন্তুর কি আছে? আপনার স্বামী আমায় আশ্বাস দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি। এখন আপনি যদি না চান, আমি উঠছি। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পরে যেন এ নিয়ে আমায় দোষারোপ করবেন না।

কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত আ। এখন আর নিজের কথার ওপর স্থির থাকতে পারলেন না শ্রীমতী গ। যদি কিছু সত্যি থাকে ভদ্রলোকের কথায়? তিনিও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে,—আপনি যে সত্যিই চললেন দেখছি!

ফিরলেন শ্রীযুক্ত আ। এবং জায়গা পেলেন সে ফ্ল্যাটে।

কিন্তু ঘুম নেই শ্রীমতী গ-এর চোখে। আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখেন ভদ্রলোকের ওপর। আর যত দেখেন ততই অবাক হয়ে যান। ও ঘরের কোথায় কি আছে, সবই তাঁর নখদর্পণে। সব স্বভাবগুলো ঠিক সেই নিখোঁজ মানুষটির মত! তাঁরই মত সোফায় আধশোয়া হয়ে কাগজপড়া। খাওয়া দাওয়ার পর যথারীতি টেবলু ল্যাম্পটা জেবলে আলমারি থেকে বই টেনে নেয়া। কিংবা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সোফার হাতলে আঙুলের টোকা দেয়া। দেখেন আর অবাক হন শ্রীমতী গ। মন বলে, কোথায় যেন একটা বিরাট রহস্য রয়ে গেছে।

মাঝে একটা দিন কেটে গেছে। দ্বিতীয় দিন সকালে শ্রীমতী গ এক

আরজি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন শ্রীযুক্ত আ-এর সামনে।

— তিনি তো কাল আসবেন তাই না ?

—হ্যাঁ, মানে ইয়ে-সেই রকমই তো কথা আছে।

—তা আজকে ভাল দিন আছে,-চলুন না আজ-কালীঘাটে তাঁর নামে পুজো দিয়ে আসি।

—না, না, অসম্ভব! ওসব মন্দিরে টন্দিরে আমি যেতে পারব না।

মন্দিরের নাম শুনলে সে মানুষও এরকম বেঁকে দাঁড়াতেন। এবার জিদ ধরলেন শ্রীমতী গ।

—কেন পারবেন না? এতে যদি তাঁর কল্যাণ হয়, তো আপনার আপত্তি কিসে ?

নিজেকে সামলে নেন শ্রীযুক্ত আ। অনিচ্ছা থাকলেও রাজী হয়ে যান। তিথি নক্ষত্রের কোন ভাল যোগাযোগ আছে নিশ্চয়ই। কালী মন্দিরে ভিড় দারুণ। শ্রীযুক্ত আ নাট মন্দির পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে থেমে গেলেন,—এত ভিড় আমার বরদাস্ত হয় না। আপনি পুজো দিয়ে আসুন, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

সেই একই স্বভাব। মন্দিরে আসবে, কিন্তু দেবীমূর্তির সামনা সামনি হবে না। ভাবলেন শ্রীমতী গ।

—ঠিক আছে, অন্যদিকে সরে দাঁড়াবেন না যেন।

শ্রীমতী গ এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে।

নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরালেন শ্রীযুক্ত আ। আনমনে টান দিচ্ছেন আর ভাবছেন কত কি। পায়ে পায়ে এক মহিলা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁর সামনে। শ্রীযুক্ত আ-এর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে স্বগতোক্তির মত বললেন,--তবে যে আমাকে খবর দেয়া হল মারা গেছে! তুমি বেঁচে আছ ?

রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কিছু ভাবছেন এমন ভাব দেখালেন।

শুনছো ?—বলে হাতের চেটো দিয়ে আলতো ঠেলা দিলেন সেই মহিলা।

—আমায় বলছেন ?

—হ্যাঁ বলছি। আর যা বলছি তা শুনতে পাওনি এমন নয়। মনে হচ্ছে জীবনে এই যেন আমায় প্রথম দেখছ ?

—মানে! কে আপনি? সত্যিই আপনাকে এই প্রথম দেখছি।

যদিও মনে মনে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন শ্রীযুক্ত আ। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই খুব ভাল করে চিনতেন এই চেহারার মানুষটিকে। কিন্তু এখন এঁকে আমল দিলে বিপদ আছে।

—হ্যাঁগো, তুমি কি বলছ! আমি যে তোমার স্ত্রী, শ্রীমতী বি। চিনতে পারছো না।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন শ্রীযুক্ত আ। ভাবলেন, ভীড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়বেন। পরমুহূর্তেই মনে হল তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিলেন,—কি বাজে কথা বলছেন? সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন, আপনার এরকম কথা নিশ্চয়ই তাঁর খুব ভাল লাগবে না। আপনার স্বামী হয়তো সত্যিই মারা গেছেন।

অসম্ভব। তোমাকে দেখে সে কথা আর বিশ্বাস করিনা। শ্রীমতী বি-এর গলা চড়ল আরো।

কি ব্যাপার, কি হয়েছে?—পুজো সাঙ্গ করে শ্রীমতী গ এসে দাঁড়ালেন আর তাঁকে দেখে এক লহমায় ফেটে পড়লেন শ্রমতী বি।

—তাই বলো! এতক্ষণে বুঝলাম। অন্য জায়গায় আবার সংসার পেতেছো? আর সেই জন্যে আমার কাছে মৃত্যুর খবর পাঠিয়েছ? লাশটা পর্যন্ত যে জন্যে আমরা পাই নি।

—তা কি করে হয়? আপনার স্বামীর মৃতদেহ আপনি দাবী করেন নি?

কটকটে চোখে শ্রীমতী গ-কে ভাল করে দেখে নিয়ে শ্রীমতী বি বললেন,—দাবী করেছিলাম বৈকি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, রেয়ার ব্রেন ডিজিজ, বডিটা গবেষণার জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। এখন বুঝেছি,—এসবের মধ্যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল।

ইতিমধ্যে পাশে বেশ ভীড় জমে গেছে। শ্রীযুক্ত আ মরিয়া হয়ে বললেন, আপনি বিশ্বাস করুন,—আমি সে লোক নই।

—আবার মিথ্যে কথা বলছ? বেশ ঠিক আছে, দেখি তোমার ডান হাত। কনুইয়ের ওপর সেই ফোঁড়া ফাটার দাগটা আছে কিনা?

দেখি বলে ঝট করে শ্রীযুক্ত আ-এর বুশশার্টের হাতাটা কাঁধ বরাবর তুলে দিয়েই চীৎকার করে উঠলেন, এখনো আমায় বিশ্বাস করতে বলবে, তুমি আমার স্বামী নও?

বলে নিজের উত্তেজনা চাপতে মাটিতে বসে পড়লেন। আপনিই চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল,—আমি কি এমন অন্যায় করেছি, যে তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ।

নানা লোকের নানান রসালো মন্তব্য শোনা গেল চারপাশ থেকে। বেশ বিপদে পড়েছেন, বুঝলেন শ্রীযুক্ত আ। কোন রকম খেয়ালিপনা না করে নিজেকে সংযত করে নিলেন তিনি। নরম গলায় বললেন,—আমি এখনও বলছি, আমি আপনার কেউ নই। এবং তার কারণও আমি আপনাকে বলবার জন্যে তৈরি। কিন্তু এখানে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে সে সব বলা চলে না। তার চেয়ে বরং আমাদের সঙ্গে চলুন,—কোন ভাল জায়গায় বসে সব বলা যাবে।

এক রকম প্রায় জোর করেই শ্রীমতী বি-কে নিয়ে ওনারা মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাসবিহারীর কাছাকাছি একটা নিরিবিলি রেস্টুরেন্টে সকলকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন শ্রীযুক্ত আ। চা খেতে খেতে নিজের এ্যাকসিডেণ্টের কথা বললেন শ্রীমতী বি-কে। নার্সিং হোমের Transplant Surgery র বিষয়েও বলতে ছাড়লেন না।

কিন্তু শ্রীমতী বি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন,—এসব আজগবি আষাঢ়ে গল্প আমি বিশ্বাস করি না।

বিরক্তি পর্বতপ্রমাণ হলেও ধৈর্য বজায় রাখলেন শ্রীযুক্ত আ। মনে পড়ল ডক্টর জ-এর কথা—যে যার বুদ্ধিমত তার সমস্যার সামাল দেয়। এর কোন নির্দিষ্ট থিয়োরি নেই। আমি আশা করি, আপনার সমস্যা আপনি নিজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু এখন হালে পানি পাওয়া ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—ঠিক আছে, আমার একটা কথা রাখবেন ?

—বলো।

—চলুন,আপনাকে ডক্টর জ-এর নার্সিং হোমে নিয়ে যাই। আশা করি, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা বুঝবেন।

—চলো। উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমতী বি।

—আপনি বরং এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুণ শ্রীমতী গ। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে দুজনে ট্যাক্সি ধরলেন।

সব কথা শুনে ডক্টর জ বললেন,—ইনি আপনাকে সত্যি কথাই বলেছেন।

খুব দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে, আপনার স্বামী সত্যিই মারা গেছেন।

—অসম্ভব! ওসব বাজে অপারেশনের কথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা ষড়যন্ত্র করে আমাকে—

—যাচ্ছেতাই। বিশ্বাস না করেন তো উচ্ছন্নে যান গর্জে উঠলেন শ্রীযুক্ত আ, আমি বললাম, ডক্টর জ নিজের মুখে সব কবুল করলেন, তারপরেও আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। যা ইচ্ছে আপনি করুন গে, শুধু জেনে রেখে দিন আমি সে ভদ্রলোক নই।

উঠে দঁাড়ালেন শ্রীযুক্ত আ, আর তাঁর রকম সকম দেখে থমকে গেলেন শ্রীমতী বি। একদৃষ্টে শ্রীযুক্ত আ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে পায়ে পায়ে খুব কাছে এগিয়ে গেলেন। চোখের ওপর চোখ রেখে বোধহয় ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করলেন তাকে। তারপর ভাঙা গলায় খুব ধীরে ধীরে বললেন,—না, এখন বুঝছি, আপনি আমার স্বামী নন। তিনি এমন চড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন না। জীবনে কখনো আমাকে জোরে কথা বলেন নি। অপারেশন যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হয়, সে মানুষের শরীরে আপনি একটা অদ্ভূত কিছু।

আর দাঁড়ালেন না শ্রীমতী বি। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও আবার থেমে গেলেন। ডক্টব জ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—যা করেছেন, তা ভাল কি মন্দ, দেশের মানুষ একদিন ঠিকই তার বিচার করবে। আমি শুধু বলতে পারি, আমরা এমন বিচ্ছিরি নোংরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করছি যে, মানুষ মারা গেলেও তাঁর দেহটা আপনাদের হাত থেকে রেহাই পায় না। জানি না, এ অগ্রগতির শেষ কোথায়!

চোখে মুখে ঘৃণা ছড়িয়ে শ্রীমতী বি বেরিয়ে গেলেন।

এবার দুজনেই চুপ। দু হাতের চেটো দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইলেন শ্রীযুক্ত আ। তাঁর হাবভাব দেখে মুচকি হাসলেন ডক্টর জ।

— এত সহজে মুষড়ে পড়লে চলেনা মশাই। পৃথিবীতে নানা মানুষ আছে, শুধু নানা কথা বলবার জন্যেই। সেসব কথায় কান দিতে গেলে চলে? স্বামীকে হারিয়ে উনি এখন ক্ষ্যাপা হয়ে আছেন, কিন্তু আমি যা করেছি তার থেকে আর দুনিয়ায় কি হতে পারে! একটা সুন্দর দেহে একটি সুস্থ ব্রেন যোগ করে একজন নিটোল মানুষকে পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ করে

দিয়েছি।

—তা দিয়েছেন, কিন্তু সে মানুষের নিজের পরিচয় বলতে কিছু নেই পৃথিবীতে। এর থেকে কি মৃত্যু ভাল ছিল না ?

আপনার একমাত্র পরিচয় আপনি মানুষ। এবং সেটাই সব থেকে বড় কথা। গম্ভীরভাবে কথা কটি বললেন ডক্টর জ।

কথাটা শুনে যেন চমকে উঠলেন শ্রীযুক্ত আ। ঠিক কথা। আর কোন কথা না বলে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে শ্রীযুক্ত আ বেরিয়ে এলেন ডক্টর জ-এর চেম্বার থেকে।

ওদিকে কথা দেওয়া আছে শ্রীমতি গ-কে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে যাবেন সেখানে। কিন্তু কি বলবেন তাঁকে। শ্রীমতী বি যে কাণ্ডটা বাঁধিয়ে তুলছেন, এখন সে ব্যাপারেও জবাবদিহি করতে হবে তাঁকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেহটাকে নিয়ে হাজির হলেন রেষ্টুরেণ্টে। ঢুকেই দেখলেন শ্রীমতী গ বেশ শান্ত ভাবে সেখানে অপেক্ষা করছেন।

—আমায় কিছু বলবার আছে আপনাকে। সব শুনে যা ভাল বোঝেন করবেন। আমার ভাগ্য নিয়ে আমি আর অন্য কাউকে পৃথিবীতে হাস্যাস্পদ করে তুলতে চাই না।

মুচকি হাসলেন শ্রীমতী গ।

—তোমায় কিছুই বলতে হবে না। দুদিন যেমন চুপ করে ছিলে, তেমনই থাকো। নিজের লোককে চিনে নিতে আমার আর মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না। মাঝের কিছু অঘটনের কথা নাই বা জানলাম। কি আসে যায় তাতে ?

—কি বলছ তুমি ! তুমি জান আমি কে ?

হ্যাঁ। মাথা নাড়লেন শ্রীমতী গ।

বিস্মিত শ্রীযুক্ত আ, —কি করে জানলে ?

—কেন তোমার চোখ দেখে। তোমার চোখ, তোমার স্বভাব প্রথম দিনই আমায় বলে দিয়েছিল, তুমি কে ? চোখই তো মানুষের আত্মার জানালা। সেই জানালা দিয়েই আমি তোমায় চিনতে পেরেছিলাম। তাছাড়া তোমার কিছু বলার অপেক্ষায় যদি থাকতাম, তাহলে কি আর তোমায় নিয়ে কালীঘাটে পুজো দিতে আসতাম ?

সত্যি !—খুশি উপচে পড়ছে শ্রীযুক্ত আ-এর মুখে। তুমি এতো ভালো ! কি বলে যে তোমায়……

বখেড়া

ঘড়ভরণ দ্বিবেদীর কাহিনীর ওপর বিশেষ আস্থা নেই সোমসাহেবের। আবার গোটা ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়েও দিতে পারেন না। কথা বলতে বলতে ঘড়ভরণ তার বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শোনা ইতিহাসে চলে যায়। ভাঙা বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে যা বলে, কাহিনী হিসেবে শুনতে বেশ ভালই লাগে সোমসাহেবের।

অনেক দিন আগেকার বথা—'তা অমন পঁচাশ-ষাট বরষ তো জরুর হোবে।' সেই সময় এক বৈষ্ণব বাবাজী বরানগরের পাঠবাড়ীতে জায়গা না পেয়ে সোজা চলে এসেছিলেন এই উল্টোডাঙায়। সঙ্গে একটা ঝোলায় ছিল একটি পুঁথিপত্র আর 'ডাহিনা' হাতে ছিল 'একঠো' নিমগাছের চারা। বরানগরে পাঠবাড়ীর ধারে গঙ্গাজীকে কিনারে' গজিয়েছিল সেই নিম চারা।

প্রথমে বৈষ্ণব বাবাজী উল্টোডাঙায় আখড়া তৈরি করেছিলেন, তারপরে রোপণ করেছিলেন সেই নিমচারা। এরপর কতকাল কেটে গেছে, সেই বাবাজীও গতায়ু হয়েছেন, তাঁর শিষ্যরা তাঁর রেখে যাওয়া আখড়ায় দিনের পর দিন নাম গান করেছেন, সেই বিরাট মহা-নিমের নীচে। সাঁঝের বেলায় বৈষ্ণবীরা রেড়ির তেলের প্রদীপ জেবলে দিয়েছে নিমতলায়। নিজেদের মনের বাসনা জানিয়ে কত ভক্ত সুতোর 'ঢিলি' বেঁধে, ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে সেই নিমগাছের ডালে।

খুব নামদার বড়িয়া জায়গা ছিল বাবুসাহেব। লেকিন সরকারনে বিলকুল খতম কর দিয়া।—বলে লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যায় ঘড়ভরণ।

চুপচাপ কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে যায়। আবার মুখ খোলে সে।

সরকার নাকি সেসব জায়গা নিয়ে নিয়েছে। আগেকার সেসব কুঁড়ে, গাছপালা আখড়া কেটে তুলে দিয়ে হাউসিং স্কীমে বড় বড় বাড়ী তৈরী করেছে। কত 'বড়িয়া বড়িয়া আদমি' কত জায়গা থেকে উঠে এসেছে উল্টোডাঙার ওইসব বাড়ীগুলোতে। শহর নাকি আরো জমজমাট হয়ে উঠেছে। 'সচ বাত', কিন্তু ওই যে নিমগাছের 'দেওতা'টিকে উদ্বাস্তু করেছে সরকার, সেই দেবতাটি তো আর অমনি ছেড়ে দেবেন না। আর সেইজন্যেই

আজ উল্টোডাঙার পথে ঘাটে এত বখেড়া দিয়ে ফিরছেন দেবতাটি—কথায় কথায়, কোথাও না কোথাও, একটা না একটা দুর্ঘটনা।

হাজার চিন্তার মাঝে আলগা হাসি ফুটে ওঠে সোমসাহেবের ঠোঁটে। অবশ্য তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন, হাজার চেষ্টা করলেও তিনি যড়ভরণের ধারণাটাকে বদলাতে পারবেন না, তাই আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়েন তার চায়ের দোকান থেকে।

উচ্ছন্নে যাক্ ওর কাহিনীর সত্যাসত্য, সোমসাহেব ভাবেন। কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে, এ অঞ্চলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। সমস্ত কলকাতা জুড়েই অল্পবিস্তর দুর্ঘটনা ঘটছে ঠিকই, তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানকার সংখ্যা কিছু বেশী। নিমগাছের দেবতাটিকে বাদ দিলেও ঐ বখেড়া ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না সোমসাহেব।

পুলিশের ওপর মহলের কর্তারা অন্য কথা বলেন। তাঁদের ধারণা. মোটর ভিক্‌লসের কর্তারা লরি কিংবা মোটরের কলকব্জা ভালমতো পরীক্ষা না করেই লাইসেন্স-এর ছাড়পত্র সই করে দেন। এ ছাড়া ড্রাইভারদের রাফ ড্রাইভিং তো আছেই।

অনুসন্ধানের কাজে নেমে সোমসাহেবের সবক্ষেত্রে তা কিন্তু মনে হয় না। প্রায় দিনপনেরো হতে চলল, থানায় বসে একটার পর একটা দুর্ঘটনার নথিপত্র ঘেঁটেছেন তিনি। পড়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ঘটনার ড্রাইভারদের একই রকম জবানবন্দী। অবশ্য জবানবন্দী শুধু তাদেরই পাওয়া গেছে, যারা বেঁচে আছে।

না, তারা কেউই নেশাভাঙ করে নি। অন্ততঃ ওই সময়ে। গাড়ীর গতিও একটা সীমিত কাঁটার গন্ডীতেই বাঁধা ছিল। কিন্তু কি থেকে কী হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারে নি তারা। রামজনম সিংয়ের স্টেটমেন্টটা মনে পড়ে সোমসাহেবের। পর পর চার-চারটি প্রাণের মহড়া নিয়ে সে তার লরিটিকে সোজা ভিড়িয়ে দিয়েছিল পথের ধারের একটা ছাতিমগাছের গুঁড়িতে। স্টিয়ারিং-এর চাপে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো নিজে আটকে গিয়েছিল সীটে। আর সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল ইঞ্জিনে। আশপাশ থেকে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেই আগুনের মাঝ থেকে অর্ধদগ্ধ রামজনম সিংহকে হিঁচড়ে বার করে পাঠিয়েছিল আর. জি. কর হাসপাতালে।

বেচারা বাঁচে নি। তবে মরার আগে সে পুলিশকে এমন একটা কথা বলে গিয়েছিল যার ব্যাখ্যা সোমসাহেবের পূর্বতন অফিসার করতে পারেননি। সোমসাহেব নিজেও বক্তব্যটিতে সন্দেহ পোষণ করেন, গোটা জবানবন্দীটিকে একটা গাঁজা-খুরি বলে মনে করেন।

কিন্তু কী সেই জবানবন্দী, যা একজন মৃত্যুপথযাত্রীর মুখ থেকেবার হওয়া সত্ত্বেও শ্রোতার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়? সেটি হচ্ছে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে নাকি রামজনম অন্ধ হয়ে যায়। পরে যখন তার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফেরত আসে, তখন সে নিজেকে চারপাশের দাউ-দাউ আগুনের মাঝে পুড়তে দেখে।

রামজনমের আগে বা পরে ঠিক এমন কথা কেউ বলে নি। তবে খুঁটিনাটি যতটা পড়ে দেখেছেন সোমসাহেব, তাতে সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এক ড্রাইভার কবুল করেছে, হঠাৎ তার মাথাটা কেমন ঝিম ধরে গেছল, কানের ভেতর বেজে উঠেছিল হাজার হাজার ঝিঁঝি পোকার মিলিত আওয়াজ, হাত-পা কেঁপে গেছল, গাড়ী চলে গেছল কন্ট্রোলের বাইরে।

কিন্তু এসব কথা তো আদালত শুনবে না। শোনেও নি। চার বছরের ঘানির মেয়াদ নিয়ে সেই ড্রাইভার এখন চার পাঁচিলের চত্বরে চাপাটি খাচ্ছে।

উল্টোডাঙা স্টেশনটাকে যদি কেন্দ্র করা যায়, সোমসাহেব ভাবেন মনে মনে, তাহলে তার মাইলদুই পরিধি জুড়ে শহরের যে বিরাট অংশটুকু পড়ে, যত দুর্ঘটনা যেন সব ওই এলাকাতেই ঘটে চলেছে। তার বাইরে কলকাতার যে বৃহত্তম অংশ এবং শহরতলি, সেখানে কি দুর্ঘটনা হয় না? হয়। কিন্তু সোমসাহেবের সমীক্ষায় এই অঞ্চলটিতেই দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশী।

পায়ে পায়ে স্টেশনে চলে আসেন তিনি।

শীতের বিকেল বুঝিবা একটু বেশী গড়িয়ে গেছে। পশ্চিমে বড় বড় বাড়ীর আড়ালে সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার থমথমে আমেজ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন সোমসাহেব।

আজ বৃহস্পতিবার। হাতে আর মাত্র তিন দিন। সোমবারেই তাঁকে শেষতম দুর্ঘটনার রিপোর্ট পেশ করতে হবে বড়সাহেবের কাছে। এটিও একটি রান ওভারের কেস। আসামী ড্রাইভার এখনো জেল-হাজতে দিন গুনছে।

কিন্তু কি রিপোর্ট পেশ করবেন সোমসাহেব? মনে মনে তেমন জোরালো বক্তব্য কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তবে আসামীকে শাস্তি দেবার মতো একটা রিপোর্ট অবশ্য যেমন-তেমন ভাবে খাড়া করে দেয়া যায়। কিন্তু শুধু মাত্র সেটুকু করতে তিনি কোনমতেই রাজী নন। তাঁর মনে, কোথায় যেন একটা খিঁচ রয়ে গেছে, এই যে একই অঞ্চলে এত দুর্ঘটনা, না না, দুর্ঘটনা নয়, বখেড়া—ঘড়ভরণের শব্দটাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন সোমসাহেব, এর পেছনে কিছু একটা আছে। সেটা কী? আচ্ছা, ও. সি. কে সব কথা যদি খুলে বলা যায়? যদিও তিনি কী চোখে নেবেন ব্যাপারটা তা আঁচ করা মুশকিল, তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

তরতরিয়ে স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন সোমসাহেব। একটা গাড়ী ধরে সোজা চলে এলেন থানায়।

আরে সোমসাহেব যে। কী খবর বলুন। নতুন কিছু অঘটন নয় তো? বড়বাবুর বড়গলার অভ্যর্থনা।

সপ্রতিভ হয়ে সোমসাহেব বলেন, না না, সেসব কিছু নয়। অমনি একটা পরামর্শ জরুরী হয়ে পড়ল আপনার সঙ্গে।

বিগলিত হাসি এবার পিছলে পড়ল বড়বাবুর গলা থেকে, তা বেশ তো বেশ তো। বসুন।......ভাল কথা, আপনার সেই অ্যাকসিডেণ্ট রিপোর্টটার কদ্দুর সোম?

—আজ্ঞে, ঠিক ওই ব্যাপারেই কিছু আলোচনা ছিলো।

ওই ব্যাপারে আলোচনা!—বড়বাবুর চোখ কুঁচকে আসে—ওই রিপোর্টের ওপরে আবার আলোচনা কী? জেনুইন রান ওভার কেস। ড্রাইভার তার স্টেটমেণ্ট কবুল করেছে।

—সে সব জানি। কিন্তু আমার বক্তব্যটা স্যার একটু অন্য রকমের। যদি শোনেন......

আর সময় না নিয়ে সোমসাহেব সোজাসুজি নিজের বক্তব্যে নেমে এলেন, একটি একটি করে প্রতিটি দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কথা ব্যক্ত করলেন।

যে কোন কারণেই হোক উল্টোডাঙ্গা অঞ্চলে দুর্ঘটনার সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশী। কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত ড্রাইভারের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট খতিয়ে দেখা গেছে যে, সে কোন রকম নেশা না করেই গাড়ী ড্রাইভ

করছিল। জীবিত ড্রাইভারদের কেউ কেউ বলেছে, তাদের কান কিংবা মাথা সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা রামজনম সিংয়ের —সে নাকি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক পলকের জন্যে।

সোমসাহেব পরিশেষে বললেন, যা-ই বলুন স্যার এতগুলো রিপোর্ট পড়ার পর প্রেজেন্ট কেসের ওপর রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে আমার মন বলছে, ফাণ্ডামেণ্টালি আমরা বোধহয় কোথাও ভুল করছি। সমস্ত ঘটনারই হয়ত অন্য কোন একটা হেতু আছে, আই মীন, একটা রহস্য আছে। অ্যাণ্ড ইন দিস কানেক্শন আই অলসো অবজারর্ভড যে, দুর্ঘটনার সংখ্যা গ্রীষ্মকালের চাইতে শীতকালেই যেন বেশী। বিশেষ করে ফ্যাটাল কেসের সংখ্যা···

আর বোধহয় ধৈর্য রাখতে পারলেন না বড়বাবু। বিস্তৃত হাসি আকর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুখে। বললেন, থামলেন কেন? বলুন বলুন আরো কি কি আপনি অবজার্ভ করলেন। যেমন ধরুন, ট্রাফিক পুলিশ নিশ্চয়ই নিয়ম-মাফিক মোড়ে মোড়ে ডিউটিতে ছিল না। কিংবা ট্রাফিক সিগন্যালগুলো নিশ্চয়ই লোড শেডিংয়ে নিভে গেছল আর আকাশের চাঁদ যথাসময়ে উঁকি না মেরে অকুস্থলে অমাবস্যা ক্রিয়েট করেছিল!

থমকে গেলেন সোমসাহেব। মনে মনে হয়ত বা ব্যথাও পেলেন একটু। সে ভাবটুকু কাটিয়ে কিছু বলার আগেই বড়বাবু পুনশ্চ সংযোজন করলেন—দেখুন মিঃ সোম, ওসব আপনি যা বলছেন, তা হলো গবেষণার কথা। আমাদের দেশে এজাতীয় গবেষণা এখনো পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। আমাদের কাজ হলো, মানে এক্ষেত্রে পুলিশের ডিউটি হলো, শুধুমাত্র প্রমাণসাপেক্ষ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে চার্জশীট তৈরি করা এবং আসামী সমেত সেটিকে ঠিক সময়ে আদালতে পেশ করা। ব্যস্,-এর-বেশী আমাদের আর কিছু করার আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি বরং সেইমতো তৈরী হন।

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না সোমসাহেব। দু-চারটে নেহাত-বলতে হয় ধরনের কথার পর তিনি বেরিয়ে এলেন বড়বাবুর ঘর থেকে। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবলেন কয়েক মিনিট। মনে মনে ভাল করে খতিয়ে দেখলেন বড়বাবুর কথাগুলো, পুরোপুরি মেনে নিতে মন চাইলো না। হলোই বা গবেষণার কাজ, থাকলেই বা দায়িত্বের কিছু বাড়তি ঝামেলা, তবু

একটু খতিয়ে দেখতে ক্ষতি কী? ফাইনাল রিপোর্ট পেশ করতে তো এখনো দু-তিন দিন বাকী আছে।

কয়েক মুহূর্ত লাগল তাঁর মন ঠিক করতে। তাঁর পরই নেমে এসে থানার চত্বরে দাঁড়-করানো মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিলেন তিনি। শুরুতেই ঠিক করলেন উল্টোডাঙ্গা স্টেশনটিকে কেন্দ্র করে মাইলদুয়েক নিজে একবার টহল দিয়ে দেখবেন কোথাও কোন সিগন্যাল পোস্ট অকেজো হয়ে পড়ে আছে কিনা, ট্রাফিক পুলিশ ঠিক ঠিক জায়গায় থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে কিনা, কিংবা ট্রাফিক রুল ব্রেক করে কোন ড্রাইভার নিজের জমিদারি চাল জাহির করছে কিনা। বড়বাবু তাঁকে এগুলি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু এগুলি তো ফেলনা নয়। বরং এইসব প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো ভুলে গিয়েছিলেন বলে মনে মনে যথেষ্ট লজ্জা পেলেন সোমসাহেব।

তা ছাড়া আর একটা কথা সোমসাহেবের মাথায় জেঁকে বসেছে, একবার দেখা করতে হবে ঘড়ভরণের সঙ্গে। সে তো তার কয়লার গোলা আর চায়ের দোকান নিয়ে দিন-রাত্তির বসে থাকে রাস্তার ধারে। গত বছরে যে বিরাট রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে উল্টোডাঙা স্টেশনে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ওর জানা আছে। দেখতে হবে ওর কাছ থেকে আরো কিছু খবরা খবর পাওয়া যায় কিনা।

মোটর সাইকেলে বেশ কয়েক ঘণ্টা এপথ ওপথ ঘুরে বেড়ালেন সোমসাহেব। কিন্তু না, এমন কিছুই তাঁর নজরে এল না, যেটাকে অস্বাভাবিক বা বেআইনি বলে মনে হতে পারে। শীতের রাত। পথ বেশ জনবিরল হয়ে এসেছে। এক ফাঁকে হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিলেন তিনি। রাত প্রায় পৌনে এগারোটা!

গাড়ীর গতি স্লো করলেন তিনি। এত রাতে ঘড়ভরণকে বিরক্ত করা কি উচিত হবে? সে যদি শুয়ে পড়ে? মনে মনে চিন্তা করেন সোমসাহেব। পরে কি ভেবে তার ডেরার সামনে এসে মোটর সাইকেলে ব্রেক কষলেন তিনি।

না, ঘড়ভরণ জেগেই আছে মনে হয়। ভেতরে আলো জ্বলছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ান তিনি দোকানের ঝাঁপের পাশে। ভেতর থেকে ঘড়ভরণের গলা ভেসে আসছে।

এত রাত্রে কার সঙ্গে কথা বলছে? সোমসাহেব কান পাতলেন।

পহেলা প্রহর মে সবকোই জাগে,
দুসরা প্রহর মে ভোগী।
তিসরি প্রহর মে তস্কর জাগে,
চৌঠা প্রহর মে যোগী।
পবনপুত্ হনুমানজী,
শ্রীরামচন্দ্রকি জয়!

টক টক টক!

টোকা দেন সোমসাহেব।

—কৌন্?

—দরজা খোল ঘড়ভরণ। আমি পুলিশসাব।

কৌন পুলিশসাব?—দোকানের ঝাঁপ তুলে দেখার চেষ্টা করে ঘড়ভরণ—আরে রাম রাম! বাবুসাহাব? ইত্‌নাহি রাতমে?

—তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল দ্বিবেদী।

বিস্ময় ফুটে ওটে ঘড়ভরণের চোখে। তাড়াতাড়ি করে দোকানের ঝাঁপ তুলে আলতো হাসি মুখের ওপর টেনে এনে বলে, আইয়ে বাবুসাব, অন্দর আইয়ে। বৈঠিয়ে। থোড়া চা-ও পিজিয়েগা তো?

—আরে না না, এত রাতে ওসবের কোন জরুরত নেই। তুমি বরং ঠান্ডা হয়ে বসে আমায় একটু সাহায্য কর দিকি। তাহলেই যথেষ্ট হবে।

দোকানের মধ্যে পাতা বেঞ্চিটাতে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন সোমসাহেব। শুধোলেন, কী পড়ছিলে? তুলসীদাস?

উত্ত কুছ নেহি বাবুসাহাব—একটু যেন লজ্জায় পড়ে গেল ঘড়ভরণ, দিনভরকে বাদ থোড়া······

আচ্ছা আচ্ছা! একটু হাসলেন সোমসাহেব, 'আচ্ছা ঘড়ভরণ, গেল বছর এই উল্টোডাঙা স্টেশনে তোমার সেই নিমগাছের দেওতাটি একটা বেশ জবর রকমের বখেড়া দিয়েছিলেন, মনে আছে? তুমি কি তখন এখানে ছিলে?

বখেড়া।

—হ্যাঁ, মানে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট।

—টিরেন একসিডেন্ট!

—হ্যাঁ, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। হাবড়া লোকাল যখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ পেছন থেকে দার্জিলিং মেল এসে হুড়মুড় করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে! তাতে বেশ কয়েকটা বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। হতা হত কিছু হয়।

হাঁ হাঁ বাবুসাহাব, হাঁ। আবি মালুম হুয়া। উয়ো তো বহুত খতরনেক থা।—বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে সেদিনকার ঘটনার মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়ে যায় ঘড়ভরণ—হাবড়া লোকালের ইঞ্জিনে কী যেন একটা খারাবি দেখা দিয়েছিল, সেদিন সে গাড়ী দো কদম আগে যায় তো তিন কদম পিছু হঠে। না জানি সিগন্যালের কোন গড়বড় ছিল এহি রকম আগুপিছু যখন চলছে, সেই সময় পিছাসে এক টিরেন হড়বড়িয়ে উয়ার পিছে ভিড়িয়ে গিয়েছিল। আরে বাস, আয়সা আবাজ!

মনে মনে আবার ছক কাটেন সোমসাহেব: সেই গাড়ীর ইঞ্জিন খারাপের সম্ভাবনা! সেই একই প্রশ্ন—সিগন্যালে গোলযোগ ছিল কিনা! আশ্চর্য কিছুতেই কোন সঠিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোনো যাচ্ছে না।

চুপ করে বসে ভাবছেন সোমসাহেব।

—বাবুজী, থোরাসে চা-ও বনাহাই?

ঘড়ভরণের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন সোমসাহেব। উঠে পড়ে বললেন, আরে না না। রাত অনেক হয়েছে। তুমি এখন আরাম কর।

পুরো দুটো দিন নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর করে বেড়ালেন সোমসাহেব। নানা জায়গায় ঘুরে নানা নথিপত্র পড়ে। ঘড়ভরণের 'দেওতাটিকে সযত্নে সিংহাসনে সমাসীন রেখে যুক্তি-সম্মত রিপোর্ট খাড়া করার কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন তিনি। বখেড়া যেই আনুক, দেবতাই হোক আর মানুষই হোক, বখেড়া তো আছেই।

উল্টোডাঙা স্টেশনের প্লাটফর্মে পায়চারি করেন আর ভাবেন সোমসাহেব। শীতের সন্ধ্যে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। পথে পথে জ্বলে উঠেছে আলো। একটা অস্বচ্ছ ঘোলাটে গোল পরিমণ্ডল বালবের চারপাশে ফুটে উঠেছে। বড়রাস্তার ওপাশে হাউসিং এস্টেটের বাড়ীগুলি শীতের কুয়াশায় সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের নিঝুম দৈত্যপুরীর মতো মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কী রকম মাথাটা ঘুরে যায় সোমসাহেবের। পলকে চোখের সামনে একটা আবছা সাদা পর্দা নেমে আসে। আবছা হতে হতে আশপাশের সব কিছুই তাঁর চোখের ওপর থেকে মিলিয়ে যায় একসময়ে। কিছুই তাঁর নজরে

আসে না। কান-মাথা ভোঁভোঁ করে ওঠে।

টাল সামলাতে স্টেশনের লোহার রেলিংটা আঁকড়ে ধরতে গেলেন সোমসাহেব। পারলেন না। টলে পড়লেন।

তারপর না জানি কতক্ষণ কেটে গেছে একটু একটু করে আবার নজর ফিরে আসে সোমসাহেবের। দেখেন, তাঁকে ঘিরে নানা মানুষের জটলা।

না না, জল আনতে হবে না রে! জ্ঞান ফিরেছে।—একজন বলে উঠল।

কী মশাই? ব্যাপার কী?—আর একজনের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা।

আহা হা, উঠবেন না, উঠবেন না! একজন হাঁ হাঁ করে ওঠেন—একটু না হয় রেষ্ট নিন।

কিন্তু তাঁর হয়েছিল কী? ঠিক বুঝতে পারেন না সোমসাহেব। শুধু ঘামছেন। এই শীতের দিনেও পোশাকের ভেতরটা ঘামে সপসপে হয়ে উঠেছে।

একটু বাদে নিজের পদ-মর্যাদার কথা খেয়াল হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। শুধোলেন আমার কী হয়েছিল বলুন তো?

আপনার? তা কী কইরা কই বলেন তো?—একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আমি আপনার পাশেই আছিলাম। যদ্দুর মালুম হয়, মাথা ঘুইরা পইড়া গেলেন।

মাথা ঘুরে! অবাক সোমসাহেব। মাথা ঘুরে গেছে ভাবতেও তাঁর খারাপ লাগছে।

সেই ভদ্রলোক আবার বলেন, হয় প্যাটে গ্যাস হইছে, নয়তো প্রেশার। ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করেন মশায়।

ডাক্তার। চকিতে সোমসাহেবের মগজে বিদ্যুৎ খেলে যায়—সমরেশ। তার বন্ধু সহপাঠী। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, আপনারা যদি কেউ দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেন।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! এক্ষনি দেখছি। কিন্তু আপনি হেঁটে প্লাটফর্ম থেকে নীচে নামতে পারবেন তো?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান সোমসাহেব—পারবেন।

ব্যস্। আর কোন কথা নয়, ট্যাক্সি নিয়ে সোজা মানিকতলায় সমরেশের চেম্বারে।

কী ব্যাপার! তুমি—সমরেশের বিস্মিত উচ্ছ্বাস।

—আরে ভাই, আর বল কেন! হঠাৎ মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেছি। থরো চেকিং করে দেখো তো ব্যাপারটা কী?

অবাক ডাক্তার বন্ধু। চোখ কুঁচকে আসে তার—তুমি পড়ে গেছ মাথা ঘুরে? আশ্চর্য! শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

বলে সোমসাহেবকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে পেশেণ্ট বেডে শুইয়ে দেন ডাক্তার সমরেশ। তারপর পেশেণ্টের জামার বোতাম খুলে দিয়ে চলে নানারকম পরীক্ষা। ব্লাড প্রেশারও চেক করা হল।

—কী হে, কেমন দেখলে?

—কী আর দেখব বল। কোয়াইট নর্ম্যাল? শুধু পাল্‌সের বিটটা একটু·····কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছিল? কোন চোর-ডাকাতের পিছু তাড়া করেছিলে নাকি?

—না না, সেসব কিছু নয়!

—তবে?

আবাল্যের সহপাঠী এই বন্ধুর কাছে কতটা খোলামেলা হওয়া যায় মনে মনে একটু খতিয়ে দেখেন সোমসাহেব। তারপর একটি একটি করে সমস্ত কথাই বলেন বন্ধুকে। নিজের ভাবনা-চিন্তা থেকে শুরু করে ঘড়ভরণের মতামত—কিছুই বাদ দেন না। ড্রাইভার রামজনম সিংয়েরঅভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর আজকের সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার কতটা মিল আছে, সেটাও উল্লেখ করতে ভোলেন না তিনি।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে বন্ধুর বক্তব্য শুনলেন সমরেশ। বেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, দেখ ভাই, তোমাদের পুলিশ লাইনের ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমি নাড়ি টিপি, বড়ি দিই। তবে মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আমি বোধহয় তোমায় একটু সাহায্য করতে পারি।

—কী রকম?

আমার এক আত্মীয় আছেন, মানে আমার ভায়রাভাই আর কি। ভদ্রলোক 'স্মোক ন্যুইসেন্স ডাইরেক্টরেট'-এ বেশ ভাল পোস্টে আছেন। সেদিন আমার বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন ছেলে-বৌ নিয়ে। তাঁকেও সেদিন ওই সব অ্যাক্‌সিডেণ্ট্ নিয়ে কী যেন সব বলতে শুনেছিলাম। যদি চাও, তো তোমাকে না হয় তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারি।

—কোথায় যেন কাজ করেন বললে?

—'স্মোক ন্যুইসেন্স ডাইরেক্টরেট'এ।

কয়েক সেকেন্ড বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সোমসাহেব বলেন, তা এসব অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়ে তাঁদের কোন বিশেষ মতামত আছে নাকি!

— সেরকমই তো শুনলাম সেদিন।

—কী রকম?

অত বলতে পারব না ভাই—ডাক্তার হাসলেন—বুঝতেই তো পারছ, সেসব হল ওঁদের নিজস্ব টেকনিক্যাল ব্যাপার। তবে তুমি যে ব্যাপারে অনুসন্ধান করছ, সে ব্যাপারে নাকি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন পরিস্থিতির বেশ একটা বড় রকমের হাত আছে। আরো কী যেন সব অ্যাসিড-ট্যাসিডের কথা বলছিলেন উনি।

অবাক সোমসাহেব। বলেন ভারি ইন্টারেস্টিং তো! তুমি পার তাঁর সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে দিতে?

— অসুবিধে কী? বেশ তো, কাল রবিবার বিকেলে আমার চেম্বার বন্ধ থাকে। আমি ফ্রী। চাও তো কালই তোমায় নিয়ে যেতে পারি।

—বেশ রাজী। কাল তাহলে বিকেল পাঁচটায়?

—এগ্রীড।

ডাক্তার বন্ধু সমরেশ আগেথেকেই টেলিফোনে কথাবার্তা বলে রেখে-ছিলেন। মিঃ মুখার্জী ওঁদের অপেক্ষাতেই ছিলেন। প্রাথমিক আলাপ-পর্ব শেষ হবার পর সোমসাহেব বললেন, আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারটা সমরেশের কাছে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন মিঃ মুখার্জী। ও বলেছিল, এ বিষয়ে আপনাদের নাকি কিছু কিছু বিশেষ মতামত আছে। সেটা জানতে পারলে আমাদের সুবিধে হয়।

মৃদু হাসলেন মিঃ মুখার্জী। তারপর খুব শান্তভাবে বললেন, আপনি ঠিক কোন্ বিষয়ে জানতে চান? স্মোক ন্যুইসেন্স-এর ব্যাপারে? তাহলে গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো যে, বিষয়টি গভীর এবং ব্যাপক।

এবার একটু ভাবনায় পড়েন, সোমসাহেব। কী বলবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। শেষে বলেন, দেখুন মিঃ মুখার্জী, আমি একটা দুর্ঘটনার অনু-

কোয়ারি রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম যে কলকাতার একটা বিশেষ অঞ্চলে দুর্ঘটনার সংখ্যা যেন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ড্রাইভিংয়ে ড্রাইভারদের স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তি ছাড়াও এমন একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে, যেটাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। পারটিকুলারলি ইন কেস অব অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।

অ্যাকসিডেন্ট—সামান্য চোখ কোঁচকালেন মিঃ মুখার্জী—দেখুন মিঃ সোম, দুর্ঘটনাকে আমরা সাধারণত অসাবধানতার পরিণাম বলে মনে করে থাকি। তবে আজকের দিনে বিশেষ করে কলকাতায় স্মোক ন্যুইসেন্সের সঙ্গে এর একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে বলে আমাদের দপ্তর মনে করে। আর আমরা যা মনে করি, তা খুব অল্প কথায় সেরে ফেলার জিনিস নয়। আপনার হাতে যথেষ্ট সময় আছে তো?

—যথেষ্ট, যথেষ্ট। কোন অসুবিধে নেই। আপনি বলে যান।

বেশ। তবে শুনুন—বলে কীভাবে শুরু করবেন মনে মনে গুছিয়ে নেন মিঃ মুখার্জী। তারপর আরম্ভ করেন—যত দিন যাচ্ছে, আমাদের কলকাতার বায়ুমণ্ডল ততই বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এসপ্লানেডের বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের এরিয়া ও উল্টোডাঙার গোটা অঞ্চলটা। এসব জায়গায় বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৭৪ পার্টস পার মিলিয়ন সালফার ডাই-অক্সাইড মিশে এক অতি ক্ষতিকারক অ্যাসিডের মিষ্ট তৈরি করছে। তার ওপর মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট ওই এরিয়ায় পাতাল রেলের কাজ করতে গিয়ে মাটির সঙ্গে প্রচুর ধুলো ওই অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে ময়দানের খোলা হাওয়া আর আগের মতো নিষ্কলুষ থাকতে পারছে না।

একটু কাশলেন মিঃ মুখার্জী। থামলেন একটু। পরে আবার শুরু করলেন—কিন্তু এখানকার থেকেও খারাপ উল্টোডাঙার অবস্থা। এখানকার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে একটা কথাই বলা যায়, ‘ইট ইজ হরিবল’ আপনারা যদি একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে খতিয়ে দেখেন, ওই অঞ্চলে দুর্ঘটনার সংখ্যা কলকাতার অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশী। কারণ? উল্টোডাঙাকে কেন্দ্র করে আপনি যদি চারধারে সমীক্ষা চালান, তাহলে দেখবেন, তার আশেপাশেই বড় বড় অ্যাসিড ম্যানুফ্যাকচ্যারিংপ্ল্যান্ট। যেখানে দিন-রাত্তির প্রোডাকশনের কাজ চলছে। ফলে অ্যাসিড ভেপার প্রতিনিয়তই দূষিত করে চলেছে বায়ুমণ্ডলকে।

এখানকার বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড তো এমনিতেই আছে, এর ওপর যোগ হচ্ছে এই অ্যাসিড ভেপার। এ দুটির মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল হঠাৎ-হঠাৎ মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলা। কখনও কখনও বা মানুষ সম্পূর্ণভাবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে।

কি বলছেন আপনি!—প্রায় চীৎকার করে ওঠেন সোমসাহেব।

—ঠিকই বলছি। খুব সম্প্রতি 'ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট তাদের সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে এই কলকাতায় কিছু না হোক, অন্ততঃ ছ হাজার কলকারখানা আছে। তারা সমবেতভাবে প্রতিদিনে ৩৯৬ টন ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গৃহস্থের জ্বালানি ছড়াচ্ছে ১২৬ টন। তাছাড়া শীতকালে টায়ার পোড়া, কাঠ পোড়ানো তো আছেই। তাহলেই বুঝে দেখুন অবস্থাটা।

তাহলে আপনি বলতে চাইছেন,—ডাক্তার সমরেশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মিঃ মুখার্জী বললেন, আমি কিছুই বলছি না সমরেশবাবু। এ বলছে আমাদের সমীক্ষা, আমাদের নথি-পত্র। শুধু দৃষ্টিশক্তি কেন, এই দূষিত বায়ুমণ্ডল এমন এক-একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, যাতে শয়ে শয়ে লোক উজাড় হয়ে যাবে। রেফারেন্স হিসেবে ১৯৪৮ সালের ক্যালিফোর্নিয়ার ডোনোরা এয়ার পলিউশনের কথা বলতে পারি, যার দরুন এক ঘণ্টায় পাঁচশো লোক মারা যান। কিংবা ধরুন ১৯৫২ সালে গ্রেট লণ্ডন ফগের কথা। লণ্ডন শহরের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর যোগা-যোগ ছিন্ন হয়ে গেছল তখন।

একটু থামেন মিঃ মুখার্জী। একটু যেন ভাবেন। পরে বল্লেন শুধু সেখানেই বা কেন? আমাদের এই কলকাতার উল্টোডাঙায় হয় নি?

উল্টোডাঙাতেও হয়েছে!—সোমসাহেবের গলা আড়ষ্টভাবে ঘড়ঘড়িয়ে ওঠে।

—ও ইয়েস। উল্টোডাঙার স্টেশন এরিয়ার এয়ার পলিউশন এমনি সাংঘাতিক যে, কয়েক বছর ধরেই জায়গায় জায়গায় নানারকম ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েই চলেছে। রেলওয়ে ড্রাইভাররা দিনের পর দিন ওপর ওলার কাছে নালিশ করেই চলেছেন যে, তাঁরা সিগন্যাল ঠিকমতো দেখতে পান না। বিশেষ শীতকালে।

চুপ করে থাকেন সোমসাহেব। তাঁর মাথার ভেতর একটা চিন্তার ছায়া

আষাঢ়ের গুরুভার মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। না, ষড়ভরনের দেওতার দান নয়, এ তবে আজকের সভ্যতার দেওয়া বখেড়া। ক্রমে বাড়িয়েই চলেছে তার সংখ্যা।

মনে পড়ে ড্রাইভার রামজনম সিংয়ের জবানবন্দী। সে নাকি অন্ধ হয়ে গেছল কয়েক মিনিটের জন্যে। আরো কয়েকটা স্টেটমেণ্ট মনে পড়ছে। কেউ কেউ বলেছে, তাদের ব্রেন সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়েছিল। বেশী কথা কি, তাঁর নিজেরই তো……

তা বলে অবশ্য আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে,—মিঃ মুখার্জী তখনো বলে চলেছেন, ড্রাইভাররা রাফ ড্রাইভিং করছেন না। বেহিসেবি ড্রাইভিং থাকতেই পারে, সব দেশেই আছে। হাতে স্টিয়ারিং থাকলে আপনা হতেই মানুষকে একটা গতির নেশায় পেয়ে বসে। তবু যা ঘটে তার সব কিছুর জন্যে হতভাগ্যদের দায়ী করা যায় না।

মিঃ মুখার্জী থামতেই সোমসাহেব বলেন, আচ্ছা মিঃ মুখার্জী, এর কি কোন বিহিত নেই? বিদেশীরা এই ন্যুইসেন্স কীভাবে কণ্ট্রোল করে?

—আরে মশাই, ওদের কথা ছাড়ান দিন। ওদের দেশে যা সম্ভব, আমাদের দেশে তা সম্ভব হতে অনেক দেরি। এখন আমাদের দেশে যে স্মোক পলিউশন' আইন চালু আছে, সেটি প্রথম বলবৎ হয় ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই আইনকে শক্তিশালী করতে একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট অর্থাৎ সংশোধনী প্রস্তাব পর্যন্ত হয় নি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।

আর কিছু বলতে পারেন না সোমসাহেব। মিঃ মুখার্জীও চুপচাপ। সমরেশবাবুও নীরব। সকলের মনই এক ভীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় যেন কোনঠাসা। এরই মাঝে সোমসাহেবের একসময় মনে হয়, বিপদ যখন আছে অথচ বিহিত নেই, সেক্ষেত্রে বখেড়া তো থাকবেই। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট রিপোর্টটা কীভাবে খাড়া করা যায়?

শব্দবাণ

কিছু মনে করবেন না, ঠিক এই সময়ে আমার চেম্বার ছেড়ে যাবার উপায় নেই।—বলে একটু থামলেন ডঃ সোম। তারপর দ্বিধা জড়ানো গলায় বললেন, তাছাড়া গিয়েও কিছু করতে পারবো বলে মনে করিনা।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে অনুরোধ জোরদার হল। ডঃ সোমের ভাসা-চাউনি গিয়ে পড়ল সুব্রতর ওপর। সুব্রত সরকার' সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র মেডিক্যাল অফিসার।

না না, আপনি যা ভাবছেন, ছেলেটির ঠিক সে অবস্থা নয়।—ডঃ সোম উত্তর দিলেন রিসিভারের ওপর মুখ রেখে ঃ—তবে হ্যাঁ ইনস্যানিটির সমস্ত লক্ষণই ওর মধ্যে বর্তমান।

আবার হয়তো অনুরোধ শুরু করেছেন টেলিফোনের অন্য প্রান্তের মানুষটি। অন্ততঃ ডঃ সোমের মুখের দিকে তাকিয়ে তাই মনে হল সুব্রতর।

—আমি ডঃ ব্যানার্জির নাম করতে পারি। নিউরোসিসের একজন অথরিটি। উপায় যদি কিছু থাকে, নিশ্চয় বাতলে দেবেন।—না না, আমি আবার কেন! আপনারাই নিয়ে যান, আমার নাম করবেন, কোন অসুবিধে হবে না।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডঃ সোম। মুখে চিন্তার ছায়া। তাকালেন সামনে বসে থাকা সুব্রতর দিকে, প্রবলেম!

সুব্রত উৎসুক চোখে তাকাল ডঃ সোমের দিকে। কিন্তু অন্যদিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন তিনি, তারপর তোমার খবর কি বলো? প্রাকটিশ কেমন চলছে?

সুব্রত বুঝল, ডঃ সোমের মনোভাব। কিন্তু নিজের কৌতূহল দমন করতে পারল না সে। বলল,—আমার কথা ছাড়ুন। আপনার পেশেন্টের কি এমন মহামারী অসুখ স্যর, যে নিজের হাতে রাখতে চাইছেন না!

একটু অস্বস্তি দেখা দিল ডঃ সোমের মুখে। তবু গলার সহজ ভাব বজায় রেখে বললেন,—রাখতে চাইনা, কারণ ব্যাপারটা বেশ ভজকটো।

মানসিক রোগ নিয়ে আমার কাজ ঠিকই, কিন্তু মিঃ কাঁড়ারের ছেলের কেসটা আমি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলে মনে করি।

—তবু?

হেসে ফেললেন ডঃ সোম,—বুঝতে পারছি, তোমার চেম্বারে কোন কাজ নেই, তাই ভেগে এসেছো এখানে।

স্মিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল সুব্রতর মুখে। সিনিয়রদের স্নেহের খোঁচা ভালই লাগে।

ছেলেটির বয়েস এমন কিছু নয়। বছর দশেক। ক্লাস ফোরে পড়তো। উপস্থিত পড়াশোনা ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে।—বলে একটু থামলেন ডঃ সোম। বোধহয় মনে মনে গুছিয়ে নেবার জন্যেই। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলেন, —শুনছো যখন, তখন গোড়া থেকেই শোনো, বলতে গেলে, জন্ম থেকেই ছেলেটির শরীর স্বাস্থ্য তেমন নয়। কিছু না কিছু ঝামেলা লেগেই থাকতো। যেমন ধরো, কানে কম শোনা। আর ছিল ভীষণ রকম পেটের গণ্ডগোল। অবশ্য সেটার একটা কারণ বুঝি। ওর মা-বাবার মুখে শুনেছি, বাচ্চা থেকেই ছেলেটি ঘুমোয় খুব কম সময়। দিনে কিম্বা রাত্রে ওকে ঘুম পাড়ানো ছিল এক সমস্যার ব্যাপার। ফলে যা হবার, প্রাণ চাঞ্চল্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। সর্বদাই কেমন যেন ঝিমিয়ে থাকতো। মিঃ কাঁড়ারের ওপর লক্ষ্মীর কৃপা আছে চিরকালই! একটি মাত্র সন্তান, অতএব ডাক্তারদের হাতের তেলোয় রেখে ছেলেটিকে এতগুলি বছর টেনে এনেছেন।

আবার থামলেন ডঃ সোম; বোধ হয় সুব্রতর শোনার আগ্রহ কতটা সেটা বোঝার জন্যে। তারপর শুরু করলেন,—বছর দু-তিন আগে, ওর বাবা-মা নতুন উপসর্গ লক্ষ্য করলেন। ছেলেটির স্মৃতিশক্তি যেন দিনকের দিন কমে যাচ্ছে।

স্মৃতিশক্তি!—অবাক চোখে ডঃ সোমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুব্রত। বোধহয় এতোগুলি অসুখের জটিল সমন্বয় কারোর হতে শোনেনি।

—হ্যাঁ, স্মৃতিশক্তি। ধরো ঘণ্টাখানেক আগে সে ব্রেকফাস্ট করেছে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে সে কথা ভুলে গিয়ে মাকে 'চেজ' করছে জলখাবার দেবার জন্যে। তাকে যে জলখাবার দেওয়া হয়েছে, সে খেয়েছে, একথা তাকে কিছুতেই বোঝানো যেতো না।

—আশ্চর্য তো।

—হ্যাঁ। এখন অবশ্য আগের মতো অতো অবুঝ নয়। মিসেস কাঁড়ার যদি বলেন, এই তো একটু আগে জলখাবার খেলি। তাহলে ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। পরে হেসে বলে, খেয়েছি নাকি? তাহলে থাক।

অদ্ভুত কথা বলে মনে হল সুব্রতর। কিন্তু স্বভাবতই তার মনের কৌতূহল প্রবল হলো, আপনি বলছেন, ছেলেটির পড়াশোনা ক্লাশ ফোর পর্যন্ত। স্মৃতিশক্তির যখন এমন অবস্থা, তখন নীচের ক্লাশগুলো সে পাশ করল কী করে?

কিন্তু সুব্রতর প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব দিলেন না ডঃ সোম।

—দ্যাটস্ নট দি ম্যাটার। এর পরের অংশটা নিয়েই ছিল আমার মাথা-ব্যথা। কেননা, এই সময় থেকেই ছেলেটি আমার ট্রিটমেন্টে আছে। আগে থেকে যোগাযোগ করে, মিঃ কাঁড়ার একদিন ছেলেটিকে নিয়ে আমার চেম্বারে এলেন। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, টোটালি ডিপ্রেসড্। তার ধারণা, ছেলেটি নাকি পাগল হয়ে যেতে বসেছে। একটার পর একটা প্রশ্ন করে যতটা বুঝলাম, ছেলেটির মনমেজাজ বা আচার আচরণের কোন ঠিক নেই। সামান্য কথায় হাসে কিম্বা কাঁদে। অসহায় ভাবে মিঃ কাঁড়ার আমায় অনুরোধ করলেন, ছেলেটির চিকিৎসার ভার নিতে।

ন্যাচার‍্যালি।—সহানুভূতি সুব্রতর গলায়।

—কিন্তু প্রথমেই আমাকে যেটা অবাক করল, এতটুকু বাচ্চার পক্ষে মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটল কী করে? এমন কি অঘটন ঘটতে পারে, যার আঘাত ও সামলে উঠতে পারেনি?

নট্ নেসেসারি।—সুব্রত বলল,—বংশগত কিছু থাকতে পারে তো?

—ইয়েস, পারে। কিন্তু তপনের ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটেনা।

—ওর নাম তপন বুঝি?

—হ্যাঁ। ওর বাবা কিম্বা মায়ের দিক থেকে এমন একজন কেউ নেই, যাঁকে ওই রোগের শিকার বলে বদনাম দেয়া যেতে পারে। জিজ্ঞাসা করলাম, পড়েটড়ে গিয়ে আরো ছোট অবস্থায় কোন আঘাত-টাঘাত পেয়েছিল কিনা? ওনারা জানালেন, এমন ঘটনা অন্ততঃ ওনাদের জানা নেই। এরপর একটা প্রশ্নই বাকি ছিল—কোন রকম শক্ বা টর্চার হয়েছে কিনা ছেলেটির ওপর, তা আমি সে প্রশ্ন করিনি।

—ভাল করেছেন স্যর। ওইটুকু বাচ্চা, তা ছাড়া আছে তো বাপ-মায়ের ছায়ার আড়ালে, অতএব ও প্রশ্ন ওঠেই না। তবে হ্যাঁ, ওনাদের অজান্তে এমন কোন ইনজুরি যদি হয়ে থাকে—

সুব্রতর কথা শেষ হবার আগেই ডঃ সোম বললেন,—না, সে রকম কিছু হয়নি। সমস্ত কিছু আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। টেস্ট রিপোর্ট সব দিক থেকে ভাল।

থামলেন ডঃ সোম, চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসলেন,—তবে এরি মধ্যে একটা রহস্যজনক ব্যাপার ঘটে গেল। তপনের কেস হিস্ট্রির পিছনে যার একটা মুখ্য ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি।

সুব্রতর মুখে আগ্রহ দেখা দিল।

—মিসেস কাঁড়ারের এক ভাই থাকেন পাত্রাটুতে। হাজারীবাগের এক ছোট্ট পাহাড়ী অঞ্চল। তারই মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ। বড়কুটুম্ব, না গেলেই নয়। মিঃ কাঁড়ার আমার কাছে ছুটে এলেন, কি করব বলুন? আপনার পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া চলে কি? একবার ভাবলাম বলি, না। যাওয়া ক্যানশেল করে দিন। কিন্তু ওনাদের অবস্থা বিবেচনা করে বললাম, চলে যান। ওষুধপত্তর সঙ্গে নিয়ে যান, আর যে সব রেসট্রিকশন দেয়া আছে, সেগুলো মেনে চলবেন। তারপর তেমন যদি অসুবিধে বোঝেন, তো চলে আসবেন। কারোর কিছু বলার থাকবে না। মজার কথা কি জানো, দিন পনেরো পর মিঃ কাঁড়ার আমার চেম্বারে এসে রিপোর্ট করলেন, পেশেন্ট নাকি প্রায় স্বাভাবিক! কখনো যে এ্যাবনরমালিটি দেখা দেয় নি এমন নয়, তবে মোস্ট অবদ্য টাইম নরম্যাল। আর তাকে পাত্রাটুতেই রেখে এসেছেন মিঃ কাঁড়ার। আমার কাছে জানতে চাইলেন, তপনের ওষুধপত্তরের ব্যাপারে এ্যাডভাইস কি? আমি রিস্ক নিলাম। কোন ব্যবস্থা না করে কমপ্লিট নেচারের ওপর ছেড়ে দিলাম।

—তারপর?

—মাস তিনেক পর তপন ফিরে এল সেখান থেকে। বলতে গেলে প্রায় কওরর্ড। কিন্তু মজার কথা হলো, বাড়ি ফেরার এক মাসের মধ্যে আবার পুরনো সিমটমসগুলো একে একে ফিরে আসতে শুরু করল।

—আশ্চর্য!

—আমার কাছেও ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য লেগেছে। চিকিৎসাপর্ব আবার শুরু হল। অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এনে, আমি আবার তপনকে রাজগীরে পাঠিয়ে দিলাম। আবার সেই মিষ্টিরিয়াস রেজাল্ট, তপন অনেকটা রি-কভার করেছে। কিন্তু নিজের ঘরবাড়ি ব্যবসাপত্তর ছেড়ে বেশিদিন তো আর সেখানে থাকা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন, এন্ড দ্য ট্রাবলস্ অলসো। এখন এ ব্যাপারে মতামত হল, একটা মেডিক্যাল বোর্ড এ্যাপয়েন্ট করে, ব্যাপারটার থরো ইন্‌ভেস্‌টিগেট করা উচিত। ডঃ ব্যানার্জির সঙ্গে আমার সব রকম কথাবার্তা করাই আছে। আশা করি কিছু একটা সুরাহা হবেই।

থামলেন ডঃ সোম। মুখের ওপর থেকে বিষণ্ণভাব অনেকটা সরে গেছে। বোধহয় এতক্ষণ কথা বলার পর নিজেকে হালকা বোধ করছেন। সুব্রতর মন ততক্ষণে অন্য কথা ভাবতে শুরু করেছে। ইতিউতি করে বলল,—একটা কথা বলব স্যার।

ডঃ সোম তাকালেন।

—এই কেসটার ব্যাপারে আমায় যদি একটু সুযোগ দেন।

বিস্ময় দেখা দিল তাঁর মুখে,—তোমাকে! ঠিক কি বলতে চাইছ?

—দেখুন, ডঃ ব্যানার্জি যা করবার করবেন। কিন্তু এরকম একটা রুগীর ব্যাপারে একজন সহকারির হয়তো কনস্‌টান্‌ট ওয়াচের দরকার হতে পারে। আমার ওপর যদি সে ভারটা দেয়া হয়, আশা করি ডঃ ব্যানার্জিকে আমি নিরাশ করব না। আর আমার ইন্‌টারেস্ট হবে, আমার এক্সপিরিয়েন্‌স।

একভাবে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডঃ সোম। অনেক পরে ভেবে বললেন,—ঠিক আছে। সত্যিকারের প্রয়োজন যদি হয়, আমি তোমার সম্বন্ধে কথা বলব ডঃ ব্যানার্জির সঙ্গে।

দিন তিন-চার পরে ডঃ সোমের টেলিফোন পেয়ে, তাঁর চেম্বারে হাজির হল সুব্রত। সুইং ডোর ঠেলে মুখ বাড়াতেই হাসিমুখে আহ্বান জানালেন তিনি, এসো সুব্রত। সুব্রত চেয়ার নিতে ডঃ সোম বললেন, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন মিঃ কাঁড়ার। তপনের ব্যাপারে ডিটেইলস্ রিপোর্ট তৈরি করার ভার ডঃ ব্যানার্জি তোমার ওপরেই দিয়েছেন। আশা করি, নাউ য়ু আর হ্যাপি।

ডঃ সোম একটু হেসে বললেন,—মিঃ কাঁড়ার অত্যন্ত সুন্দর মানুষ।

তোমার প্রথম ডিউটি হবে, ওনার হাওড়ার বাড়িতে গিয়ে তপনের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করা। আর ডঃ ব্যানার্জি ঠিক কী কী তথ্য জানতে চান, তা এইতে পাবে—একটা খাম সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি, সেগুলো দেবার চেষ্টা করবে।

অনেক ধন্যবাদ স্যার।

এটা ওটা নানা কথার পর মিঃ কাঁড়ারের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল সুব্রতর। পরের দিন সকালেই সে ওনার হাওড়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

বেশ বিরাট বাড়ি মিঃ কাঁড়ারের। নিজেরা থাকেন দোতলায়। সমস্ত নিচের তলাটা জুড়ে মস্ত বড় কারখানা। মিঃ কাঁড়ার নিচের অফিস ঘরেই ছিলেন। সুব্রতকে দেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পাশের একটা চওড়া সিঁড়ি দিয়ে তিনি সুব্রতকে ওপরে নিয়ে গেলেন। দোতলার বসবার ঘরে তাকে বসিয়ে, মিঃ কাঁড়ার ভেতরে চলে গেলেন।

সুব্রত দেখল, সমস্ত ঘরটাই বেশ মানানসই আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। আর যাই হোক, রুচির বদনাম কেউ দিতে পারবে না। রঙীন পর্দার আড়াল দেয়া বেশ বড় বড় জানালা, যদিও তিন দিকের জানালা দিয়ে আকাশ চোখে পড়ল না তার। উঠে পড়ল সুব্রত, একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল সে। ডঃ ব্যানার্জির প্রয়োজনে, সব কিছু দেখে নেয়ার একটা তাগিদ আছে। পর্দা সরিয়ে তাকালো বাইরের দিকে, আর প্রথম দর্শনেই তার মনে হল, চারিদিকে যেন কারখানার জঙ্গল। একদিকে বিরাট এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড়; লম্বা-মাঝারি টিনের শেড। পুরোদমে কাজ চলছে সেখানে। নানা বিচিত্র আওয়াজের একত্র সমাবেশ। শেডগুলোর পরেই বোধ হয় ঢালাই কারখানা। ফার্নেসের চিমনির ওপর লকলক করছে আগুনের লালাভ শিখা।

কী ব্যাপার, আপনি ওখানে?—মিঃ কাঁড়ার কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পিছু ফিরতে সুব্রত দেখল, মিঃ কাঁড়ারের পেছনে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে, সঙ্গে একটি ন' দশ বছরের রোগা-পাতলা ছেলে। সৌজন্যের হাসি দেখা দিল সুব্রতর মুখে, কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল,—তুমিই তপন?

ছেলেটি সে কথার জবাব দিলনা। সুব্রত লক্ষ্য করল, সভয় আড়ষ্টতায় তপন নিমেষে সরে গিয়ে দাঁড়াল মায়ের পিছনে।

—কি হলো, আমাকে দেখে পালাচ্ছো কেন? শোনো-শোনো, কাছে এসো!

—যাও, ভয় কি? উনি তোমার সঙ্গে গল্প করতেই তো এসেছেন।

মিঃ কাঁড়ার ভরসা দিলেন ছেলেকে। কোন কাজ হলনা তাতে।

পাশাপাশি সোফাগুলোতে গিয়ে বসলেন সকলে। নানা কথাবার্তার ফাঁকে সুব্রতর চোখ পড়ে রইল তপনের ওপর। হাবভাবে কেমন যেন একটা উদাসীন চাঞ্চল্য। সুব্রতকে খুব একটা নজর করছে তা-ও মনে হলনা। মাথার ওপর বনবন ঘুরতে থাকা পাখাটার দিকেই তার নজর বেশি।

—তারপর তপনবাবু খবর কী বলো?

যথেষ্ট নরম গলায় ডাকল সুব্রত। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, তার ডাক শুনে তপন যেন চমকে উঠল। মুহূর্তে রুক্ষ হয়ে উঠল তার চোখের চাউনি,—তোমার কাছে যাবো না, কক্ষনো যাব না।

কেন, কী দোষ করলাম আমি!—হাসির প্রলেপ সুব্রতর মুখে।

—তোমার গলায় তো দড়ি ঝুলছে। তোমার কাছে গেলেই তুমি ইলেক্‌ট্রিক তার জড়িয়ে আমায় কষ্ট দেবে।

অকারণ উচ্চ হাসি দিয়ে নিজের সরলতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে সুব্রত, তা কখনো পারি নাকি? তোমার মত সুন্দর মিষ্টি ছেলে, আমি খুব কম দেখেছি। মিছিমিছি তোমাকে কষ্ট দিতে যাবো কেন?

এ কথার কোন প্রতিফলনই দেখা গেল না তপনের মুখে। সুব্রত তার চেষ্টায় অব্যাহত রইল,—তাছাড়া আমার গলায় দড়ি আছে বলে ভাবলে কী করে?

—ওই তো তোমার গলায় দড়ি!

—কই?

—ওই তো, লালপনা, ঝুলছে।

নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সুব্রত,—এটা তো নেকটাই!

—তুমি ভালো লোক নও, চলে যাও আমাদের বাড়ি থেকে।

সুব্রত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সভয়ে লক্ষ্য করল তপনের চোখেমুখে উত্তেজনা ফেটে পড়ছে। তীক্ষ্ম কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল;—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি!

—তপু চুপ করো। ওকি, ছিঃ! উনি তোমায় দেখতে এসেছেন।

তপনের মা পিছু ফিরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অদ্ভুত জিদ তাকে তখন পেয়ে বসেছে,—না, ওকে চলে যেতে বলো।

সুব্রত ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। যত যাই হোক, উত্তেজনা ভাল নয় কিছুতেই। মিঃ কাঁড়ারের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। তপনের মা ছেলের হাত ধরে দ্রুত ভেতর বাড়িতে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। সুব্রতকে দাঁড়াতে দেখে মিঃ কাঁড়ার বললেন, না না, আপনি বসুন। ওকে রেখে আমি এখুনি আসছি।

ওনারা তপুকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ঠিক তার পরেই মাথার ওপর পাখাটার ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত দেখল, চারপাশের কারখানার শব্দময় পরিবেশ এক অদ্ভুত নিরবতায় ভরে গেল। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও, পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল লোডশেডিং। আবার সে বসে পড়ল সোফাটায়। কয়েক মিনিটের ব্যবধান, কিন্তু পূর্বের শব্দগুলো আবার ফিরে এল দ্বিগুন হয়ে। ভট্‌ভট্‌ আওয়াজ করে, চারপাশে একটার পর একটা জেনারেটর্‌ সবিক্রমে তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। সুব্রতর মনে হল, পায়ের তলায় মেঝেটা যেন কাঁপছে থর থর করে! আবার উঠে দাঁড়াল, পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হল জানালার পাশে। দেখল, আশপাশের ছোটবড় সমস্ত কারখানার শেডের সরু সরু নল দিয়ে ভট্‌ ভট্‌ আওয়াজে ডিজেল পোড়া কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। ঠিক যেন সরীসৃপের বিষশ্বাস, হুংকারে থরহরি চারদিক।

এই আর এক উৎপাত। এই গেল, কখন আসবে কে জানে।—মিঃ কাঁড়ার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

সুব্রত আবার তার পুরনো জায়গায় ফিরে এল,—এখানকার সব কারখানাতেই জেনারেটর আছে দেখছি।

উঁহু!—সুব্রতর জবাবে মিঃ কাঁড়ার বললেন,—জেনারেটর এখানে মাত্র তিন জনের আছে। আমার, আর দু-জনের। বাকি যা দেখছেন, সব অয়েল ইঞ্জিন।

—তাইনাকি? কিন্তু আপনার বাড়ির ফ্লোর তো কাঁপছে দেখছি। এ অবস্থা বেশিদিন চললে, আপনার বাড়ির পরমায়ু আর কদ্দিন?

—কি করা যাবে বলুন? কাজ কারবার বজায় রাখতে গেলে নান্য পন্থাঃ।

কথাবার্তা আর বেশীদূর এগোয়নি। সুব্রত বেরিয়ে পড়েছিল। ইচ্ছে করেই হাঁটতে শুরু করেছিল। দেখল, ও অঞ্চলের দু-একটা সদর ঘরেও লেদ

মেসিন চলছে। চলছে ভি, বেল্টের অবিরাম ঘূর্ণন। চলতে চলতে তার একটা কথাই মনে হল, অর্থের পিছু ছুটতে ছুটতে, এখানকার মানুষ কিভাবে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে।

সেদিনের পর আরো কয়েকবার সুব্রতকে যেতে হয়েছে মিঃ কাঁড়ারের বাড়ি। ডাক্তারি ধড়াচূড়া ছেড়ে, ধুতি পাঞ্জাবি পরায়, তপন অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছে তাকে। দিন পনেরর মধ্যেই সে তার অবজারভেশন রিপোর্ট সাবমিট করে দিল ডঃ ব্যানার্জির কাছে। যদিও একটা চিন্তা তার রয়েই গেছিল, সেটা পড়ে ডঃ ব্যানার্জি তার ওপর কি মনোভাব নেবেন!

দিন তিন-চার পরে ডঃ সোমের টেলিফোন পেল সুব্রত,—ডঃ ব্যানার্জি তোমায় দেখা করতে বলেছেন। আজ সন্ধ্যা সাতটায়, তাঁর চৌরঙ্গীর চেম্বারে। হাতে একটু বেশী সময় নিয়ে যেয়ো।

কী ব্যাপার স্যর, কিছু গোলমাল বেরিয়েছে নাকি রিপোর্টে?—উদ্বেগ সুব্রতর গলায়।

—তা বলতে পারি না। তবে ঘাবড়ে যাবার কি আছে, আমিও থাকছি। তেমন তেমন বুঝি, সামলে দেয়া যাবে।

—আপনিও থাকছেন? ঠিক আছে।

স্বস্তি বোধ করে সুব্রত।

প্রায় পৌনে সাতটা নাগাদ ডঃ ব্যানার্জির চেম্বারে পেঁছে সুব্রত দেখল, ওয়েটিং রুমে ডঃ সোম বসে আছেন। তার পরেই দেখতে পেল মিঃ কাঁড়ারকে, সঙ্গে তপন ও তার মা। সুব্রতকে দেখে সকলের মুখে অভ্যর্থনার হাসি দেখা দিল।

—কী ব্যাপার ডঃ ব্যানার্জি নেই নাকি?

—আছেন, রুগী দেখছেন। লাষ্ট বাট ওয়ান, তার পরেই আমাদের টার্ন। ডঃ সোম জবাব দিলেন।

সুব্রত আর কোন কথা না বলে তপনকে নিয়ে মেতে রইল।

কিছু পরেই ডঃ ব্যানার্জি বেরিয়ে এলেন। মাঝামাঝি খালি একটা সোফার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন,—তাহলে সুব্রত, তুমি এসে গেছ? এবারে আর আমাদের কাজের কথা শুরু করতে আপত্তি কোথায়? সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, প্রথমেই বলি- তোমার কেস স্টাডি খুব ভাল হয়েছে যাকে বলা যায় নিখুঁত। কিন্তু ডিসিসনে কিছুটা ইতিউতি ভাব লক্ষ্য

করেছি যেটা থাকা উচিত ছিল না। অর্থাৎ কিছুটা সেলফ্ কনফিডেন্সের অভাব। যাই হোক, আশা করব পরে ওটা শুধরে যাবে। এখন আসল কথায় আসা যাক—

বলে একটু থামলেন ডঃ ব্যানার্জি। সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—তপনের অসুস্থতার হেতু হিসাবে, সুব্রত দায়ী করছে তার পারিপার্শ্বিককে। আমিও ওর সঙ্গে একমত। এখানে পারিপার্শ্বিক বলতে, সুব্রত মাত্রাতিরিক্ত অবাঞ্ছিত আওয়াজ ও অস্বাভাবিক কোলাহলকেই বোঝাতে চেয়েছে। সুব্রতর রিপোর্ট বলছে, জন্ম থেকেই তপন এমন একটা জায়গায় বড় হয়ে উঠেছে, যার চারপাশে ঘন কারখানা অঞ্চল। এমন কি যে বাড়িতে সে থাকে, ঠিক তার নীচেটাতেই আছে একটা বড়সড় মেশিন শপ। হ্যামারিং থেকে ওয়েলডিং, হয়না এমন কাজ নেই। এই যে পরিবেশ, এটাকেই তপনের নেচার 'বেয়ার' করতে পারেনি।

এক্স্‌কিউজ মী।—ডঃ সোম মুখ খুললেন,— সুব্রতর রিপোর্ট আমার জানা নেই, আমার প্রশ্ন, ও অঞ্চলে আরো অনেকেই বসবাস করছে। তাহলে তাদের কারো না কারোর মধ্যে সেম্ রি-এ্যাকশন্ দেখা যেতে পারতো।

—নিশ্চয় পারতো, ডঃ ব্যানার্জি তাঁর যুক্তিতে অটল, খুঁটিয়ে ওই অঞ্চলে কাজ করলে, আমি তো মনে করি, আরো নানা কমপ্লিকেসির সন্ধান আমরা পেতে পারি। আসলে অতিরিক্ত 'নয়েজের' কুফল সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষ ওয়াকিবহাল নয়, সে কারণে ব্যাধির সব রকম উপসর্গকেই, ও অঞ্চলের মানুষ সাধারণ ব্যাপার বলে ভুল করে আসছে। অতএব কোথাও কোন অভিযোগ নেই।

যেমন ?—মিঃ কাঁড়ারের প্রশ্ন।

যেমন ?—ভাবতে একটু সময় নিলেন ডঃ ব্যানার্জি! তারপর তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—যেমন তপন। একমাত্র তপনের কেসটা বিচার করে দেখলেই, আপনার অঞ্চলের ওপর একটা মোটামুটি ধারণা খাড়া করা যেতে পারে। ডঃ সোম তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, জন্ম থেকেই তপন কানে কম শোনে। এই যে কম শোনা, এর কারণ কি ? শব্দের প্রবলতা বোঝাতে, আমরা যে ডেসিবেল মাত্রা ব্যবহার করি, সে বিষয়ে নিশ্চয় আপনি ওয়াকিবহাল। এখন কত ডেসিবেল শব্দের চাপ একটা বাচ্চার কানে সহনীয়, সেটা জানা দরকার।

কতোটা ?—সুব্রতর কৌতূহল।

—মাত্র ১০—১৬/ওয়াট (সে. মি) ২। এটা হল শ্রবণ সাধ্যতা শুধুমাত্র। এখন এই পরিমাণ শব্দকে শূন্যমাত্রা ধরে হিসেব করলে ৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত একটি পরিণত বয়সের মানুষ সহ্য করতে পারে। তপন জন্ম বধির নয়, মিঃ কাঁড়ারের বাড়ির নিচের মেশিন শপের হ্যামারিং-ই, ওর কানে কম শোনার আসল কারণ। কেননা এক একটা হ্যামারিং-এর আওয়াজ কিছু না হোক ১৩০ থেকে ১৪০ ডেসিবেলের ওপর নিশ্চয়ই। যেটা বাচ্চার কানের পর্দার পক্ষে 'টু-মাচ'।

একটু থামলেন ডঃ ব্যানার্জি,—ডঃ সোম তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, তপনের ঘুম ভীষণ অল্প, যে কারণে তপনের পেটের গণ্ডগোল। কারেক্ট, ঘুম না-হওয়া অনেক সময়ই পেটের রোগকে ডেকে আনে। হৈ-চৈ গোলমালে ঘুম কখনো 'সাউণ্ড' হয়না। সাধারণতঃ শব্দ বা আওয়াজ যদি ১০০ ডেসিবেলে পেঁছয়, তাহলে একজন বড় মানুষও অস্বস্তি বোধ করে। অতএব একটা বাচ্চা যে ঘুমোবে না, বা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্য কি? পরে পরে এল ওর স্মৃতিভ্রংশতা। তার পর এল পাগলামির ভাব। এ কথা অনেকেই জানেন নিদ্রাহীনতা পাগলের অন্য উপসর্গ, কিম্বা পাগল মাত্রেরই চোখে ঘুম থাকে না।

ডঃ ব্যানার্জির কথাগুলো সকলের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। নূতন কোন জিজ্ঞাসার জন্যে মুখ খুলতে যাবেন মিঃ কাঁড়ার, এমন সময় ডঃ ব্যানার্জি আবার শুরু করলেন—এমনিতেই আমাদের শহরের মানুষের জীবনে কত রকমের ডিস্‌টারবেনস্‌! এই যে ট্রামের আওয়াজের ঘড়ঘড়ানি, ১০২ ডেসিবেল শব্দমাত্রা বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তেমনি একটা ইলেকট্রিক হর্ণ দিচ্ছে প্রায় ১১০ ডেসিবেল। পুজো-আচ্চায় যে মাইক বাজানো হয়, তার পরিমাণ হল ১০৫ ডেসিবেল। যে কারণে শহরের মানুষের ঘুম কম। মেজাজ তিরিক্ষে। জন স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে, ঘন বসতিপূর্ণ জায়গা থেকে সমস্ত ছোটবড় কারখানাগুলোকে সরিয়ে অন্য অঞ্চলে কি গড়ে তোলা যেতোনা?

—আপনি তো অনেক বড় পরিকল্পনার কথা বলছেন!

—বলছি। আর এও বলছি, পরিকল্পনা করে শিল্পাঞ্চল যখন গড়ে তোলা হয়নি, তখন তার মাশুল আমাদের দিতে হবে বৈকি! এখন এক তপনকে নিয়ে আপনি ভুগছেন, ভগবান না করুন, দু-বছর পরে হয়তো তপনদের হার আরো বেড়ে যাবে।

এ কথাটা কিন্তু খুব শ্রুতিমধুর নয় ডক্টর ডঃ ব্যানার্জি।—ডঃ সোম যথেষ্ট নরম গলায় তাঁর যুক্তি রাখলেন,—আজকের ইন্‌ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের যুগে পৃথিবীর সব দেশেই কলকারখানার প্রসার ঘটছে। শুধু আমাদের ওপরেই আপনার এমন মর্মান্তিক উক্তি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে নিলেন ডঃ ব্যানার্জি। বুঝতে পারলেন, কথাটা রূঢ় হয়ে গেছে। গলার স্বর যথেষ্ট নরম করে এনে বললেন,—আমি খুব দুঃখিত ডঃ সোম। আমার বলার ধরণটা খুব ভাল হয়নি। তবে আমার কাছে আপনার প্রশ্নের জবাব আছে। পৃথিবীর সমস্ত ডেভেলপড্ কান্ট্রি এই একই শব্দরোগে ভুগছে। পরিসংখ্যানগুলো আমার মনে আছে, একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় শব্দ এত তুমুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে কারণে সেখানকার মানুষের অফিসের কাজ করার ক্ষমতা অনেক কমে যায়। সেই ক্ষতির পরিমাণ বছরে বিশ লক্ষ ডলার। এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। আওয়াজ বেশি হওয়ার দরুন, কারখানার শ্রমিকদের হিয়ারিং ক্যাপাসিটি ক্রমশই কমে আসছে। সেখানকার শিল্পপতিদের মোটা টাকা গুণাগার দিতে হচ্ছে শ্রমিকদের। বৃটেনে শব্দের কারণে নিউরোসিসে ভোগে প্রতি দশজনে তিনজন। ফ্রান্সে মানসিক বিকারের হসপিটালে, প্রতি পাঁচজনে একজন বিকৃত রোগী ভর্তি হচ্ছে। পরিসংখ্যান করে সেখানে দেখা গেছে, মাত্রাতিরিক্ত শব্দের মধ্যে থাকার ফলে হার্টের রোগ একটা কমন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে, আরো কি চান, মানুষের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার মূলেও ওই শব্দ। ওখানকার ডাক্তারদের মতে, প্রতি তিনটি নিউরোসিস রোগের একটি, প্রতি চারটি মাথা ধরা রোগের একটির কারণ হচ্ছে শব্দ।

বন্ধ হল ডঃ ব্যানার্জির বলা। একটা গভীর নীরবতা ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর। সকলেই যখন চুপ, তখন সুব্রত বলল,—ওদেশের বৈজ্ঞানিকেরা কিছু ভাবেন নি এ বিষয়ে?

হাসলেন ডঃ ব্যানার্জি,—ক্লেভার চ্যাপ, শেষ পর্যন্ত না জেনে থামতে চাওনা। শোনো, ফরাসী বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জীন বয়ার পরীক্ষা করে দেখেছেন কোন অফিসে যদি গোলমাল ২০ ডেসিবেল কমিয়ে আনা যায়, তাহলে সেই অফিসের কর্মক্ষমতা শতকরা ৯ ভাগ বেড়ে যায়। আর বানান ভুলের সংখ্যা কমে শতকরা ২৯ ভাগ। বিশেষজ্ঞের মত হল, যতখানি সম্ভব কোলাহল

কমিয়ে আনতে হবে। শব্দের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে, বাড়িঘর তৈরি করতে হবে রাজপথ থেকে দূরে। কলকারখানার আওতার বাইরে! গ্রামের কোলাহলহীন পরিবেশে।

এক কথায় বলুন, একেবারে বনং ব্রজেৎ।—ডঃ সোমের টিপ্পনি।

হালকা হাসির ঢল বয়ে গেল ঘরে। ডঃ ব্যানার্জিও হাসলেন। পরে হাসি থামতে বললেন,—দেখুন একেবারে বনে যাবার পরামর্শ কাউকে দিইনা। তবে এটা তো ঠিক, দেশের শিল্পসংস্থা, পরিবহনসংস্থা, পৌরকর্তৃপক্ষ, সর্বোপরি জনসাধারণ, সকলে মিলে যদি চেষ্টা করেন তাহলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি করা যায় বৈকি। আসলে সব বিষয়ে চেষ্টার বড় অভাব আমাদের মধ্যে।

—তা না হয় হল, কিন্তু আপনার পেশেন্টের ব্যাপারে কি করা হবে?

ডঃ সোমের কথায় তপনের দিকে তাকালেন তিনি,—কিচ্ছু করতে হবে না। ওর নেচার যা চায়, তা আগেই ইনডিকেট করেছে। ওকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন, যেখানে প্রকৃতি এখনো পর্যন্ত তার নিজের মতো আছে। দেখবেন, খুব সহজেই নিজেকে সামলে নেবে।

———

মাটিতে মৃত্যু

এনকোয়ারি কাউণ্টারে কে যেন বাদানুবাদ করছে অনেকক্ষণ থেকে। ব্যাপারটা কি? হাতের কাজ ফেলে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডঃ সোম। তাঁকে দেখে এক প্রৌঢ় এবার সামনে এগিয়ে এল এবং ডঃ সোমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—তুমি ডক্টর?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করতেই মানুষটি ঝাঁঝিয়ে উঠল,—ডোণ্ট মাইণ্ড ইয়ংম্যান, তোমাদের মাথায় ঘিলু বলে কি কোন বস্তু নেই? নিশ্চয়ই নেই। থাকলে কখনো এমন সার্কুলার জারি করতে না। আমার মনে হয়, চাকরিতে বহাল করার আগে তোমাদের বাজিয়ে নিতে গভ্‌মেণ্ট একেবারে ভুলে গেছে।

আপনি চুপ করবেন?—সশব্দে উঠে দাঁড়ালেন এনকোয়ারি ক্লার্ক।

ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিলেন ডঃ সোম। কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগলেও বক্তার বয়সের দিকে তাকিয়ে নিজেও চুপ করে রইলেন। মুখের হাসি ভাবটা মিলিয়ে যেতে দিলেন না। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন মানুষটিকে। সোনালী সাদায় মেশা একমাথা এলোমেলো চুল। উঁচু হনুদুটোর ওপর কটা তামাটে দাড়ি। কোটরগত চোখদুটো যেন রাগে জ্বলছে।

—আপনার নাম জানতে পারি?

—ও সিওর! আমি মিঃ থেইরি, এই শিপম্যান ভিলেজের একজন চাষী।

বুঝলাম। কিন্তু মিঃ থেইরি, আমরা যে কথা বলছি, সেটা যে আপনাদের ভালোর জন্য এটা স্বীকার করবেন তো?—যথেষ্ট নরম ভাব ডঃ সোমের কথায়।

—এ্যাবসার্ড! তা যদি ভাবতাম, তাহলে এখানে আসার প্রয়োজন হতো কি?

—এরকম না ভাবার কারণ?

ডক্টর, তুমি কি মনে কর, আমার ভাল তুমি আমার থেকে ভাল বোঝ? —হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ থেইরি ঃ আমার কত বয়েস হয়েছে জানো? সিকস্‌টি সিক্‌স ইজ রানিং, এণ্ড স্টীল

আই ক্যান মুভ লাইক এ ইয়ং ম্যান। বলতে পারো কি দিয়ে আমি আমার শরীরটাকে মজবুত রেখেছি ?

—কিছুটা আন্দাজ করছি।

—কিস্সু পারছো না, পারলে—আমাকে আমার জমির ফসল খেতে কখনো বারণ করতে না। দ্যাখো আমি চাষীর ঘরের ছেলে, আমি নিজের হাতে যে ফসল ফলাই তাই দিয়েই এতকাল এই দেহটাকে এত সক্ষম রেখেছি। ঈশ্বরের ডাক পাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও—

ডঃ সোম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই এনকোয়ারি ক্লার্ক বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে,—আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ থেইরি, এটা হল সরকারি নির্দেশ। গভর্মেন্ট সন্দেহ করছে, যে ভাবেই হোক এখানকার মাটি পয়জনাস হয়ে গেছে। যে কারণে এ অঞ্চলে ব্যাপক স্টমাক ট্রাবল দেখা দিয়েছে। আপনার উচিত, সরকারের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করা।

বিদ্রুপে ভরা অবহেলার হাসি দেখা দিল মিঃ থেইরির মুখে,—নিশ্চয় উচিত। কিন্তু সরকার যদি নাবালকের মতামতের ওপর নির্ভর করে নোটিশ জারি করে, তাকে মূল্য দিতে আমি রাজি নই।

—তাহলে আপনি, আপনার ফ্যামিলির মেডিক্যাল চেক আপ করাতে আনছেন না এখানে ?

ও নেভার।—এনকোয়ারি ক্লার্কের ঝাঁঝালো প্রশ্নকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে মিঃ থেইরি বলে চললেন ঃ আমি জানি আমার ক্ষেতের মাটিতে এমন কিছু নেই, যা আমার পক্ষে সত্যই ক্ষতিকর। মিছিমিছি আমি মেডিক্যাল এসিস্টান্স্ নিতে যাব কেন ?

কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পিছু ফিরলেন মিঃ থেইরি। ডঃ সোম দেখলেন উচুনীচু পাহাড়ি পথ দিয়ে বেশ ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে নীচের ঢালু অংশে মিলিয়ে গেলেন মানুষটি রাগে বিড়বিড় করতে করতে। এনকোয়ারি ক্লার্ক বললেন—ঠিক আছে। আমি আইনের আশ্রয় নেব। ঈশ্বর কেন যে এমন এক একটা আড়ু দাতালা পৃথিবীতে ছেড়ে দেন।

ক্লার্কটি টেলিফোনের দিকে এগোতেই বাধা দিলেন ডঃ সোম,—তুমি এ নিয়ে আর মাথা ঘামিও না ! উনি এ গ্রামের একমাত্র মানুষ তো নন, আরো পাঁচজন আছেন।

—কিন্তু ওই বুড়োকে বিশ্বাস কি? সকলকে নিজের মতো করে বোঝাবে, তাতে বিপদের ঝুঁকি বাড়বে বই কমবে না।

—এমন আর কি? তাছাড়া আমাদের মোবাইল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট তো আছেই।

আর দাঁড়ালেন না ডঃ সোম। সামনের লনে নেমে পড়লেন তিনি। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন কাঠের গেটটার পাশে। সামনের কিছু জমি জমার পরই দূরে দূরে গ্রামের পত্তনি। কোনা উঁচু লাল টকটকে টালির আচ্ছাদনের নীচে ছোট ছোট কটেজগুলো। যদিও শীত শেষ, তবু বিকালের হাওয়ায় তার কিছুটা আমেজ।

না, নিজেকে কোন ঝুট ঝামেলায় জড়ানোর ইচ্ছে নেই ডঃ সোমের। ইউনিট ক্যাপটেন ডক্টর টেইলর আছেন মাথার ওপর। নিতান্ত কিছু যদি করতেই হয় তিনিই করবেন। ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে শান্তিকামী বলে একটা সুনাম আছে, সে সুনামটুকু নষ্ট করতে রাজি নন ডঃ সোম। কলকাতার মানুষ তিনি, আর. জি. করের কোর্স শেষ করে এম. আর. সি. পি. করতে এসেছিলেন এদেশে,—কাজ সাঙ্গ হয়েছে। মোবাইল ইউনিটের দিনগুলো শেষ করে ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে চান দেশে।

তাছাড়া ওই বুড়ো মানুষটিকে খুব একটা দোষ দিতে পারেন না তিনি। দীর্ঘ জীবনের ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাস বলে একটা কথা আছে। হঠাৎ কিছু ছোকরা বিজ্ঞানী আর কয়েকটি ডাক্তারের কথার ওপর চট করে আস্থা না রাখতেও তো পারেন।

এসব নানান কথা যখন মনের ভিতর খেলা করছিল, তখন হঠাৎ নজর পড়ল,—দূরের পিচ ঢাকা সড়ক দিয়ে তাদের ইউনিট বাসটা হু হু করে এগিয়ে আসছে। কিছু পরেই হেলথ সেণ্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডঃ সীমুর, মিঃ ওয়াল্টার আর শ্রীনিবাসন নেমেএলেন দরজা খুলে। অন্যেরা স্মিত মুখে ঢুকে পড়ল হেলথ সেণ্টারে। দাঁড়িয়ে পড়ল শ্রীনিবাসন,—কি ব্যাপার সোম, একলা দাঁড়িয়ে যে বড়?

—এমনি। তারপর তোমাদের ইনভেষ্টিগেশন কদ্দুর এগুলো?

—এগোচ্ছে, বাট নট আপ টু দ্য মার্ক। তোমাদের খবর কি? প্যাথলজি-ক্যাল টেস্টে কিছু মিলল?

—নট রিমার্কেবল, তবে ইউরিনে বেশ কিছু পুঁজভর্তি কোষ ধরা পড়েছে,

কিন্তু সেগুলি ঠিক কি জাতের কিছু সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

রহস্যের হাসি দেখা দিল শ্রীনিবাসনের মুখে,—দ্যাখো দ্যাখো, নিশ্চয়ই আইডেণ্টিফাই হবে।

দিন পনেরো হল ডঃ সোম আরো কয়েকজন বৃটিশ মেডিক্যাল এক্সপার্টের সঙ্গে এখানে এসে আছেন। সঙ্গে আছেন আরো জনা দশেক ভূ-বিজ্ঞানী। মিলে মিশে দুটো ইউনিটকে একসঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। বেশ কয়েকমাস ধরে এ অঞ্চলের মানুষ এক বিচিত্র পাকস্থলীর অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। যেহেতু এই অঞ্চলটা ভাল পানীয় তৈরীর জন্যে বেশ বিখ্যাত, সেজন্যে স্থানীয় মেডিক্যাল প্রাকটিশনাররা অনুমান করেছিলেন,—এটা বোধহয় সেই মদেরই কোন বিষক্রিয়া। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল, ব্যাধিটি ছেলে-বুড়ো-মহিলা কাউকেই ছেড়ে কথা বলছে না, তখনই ওপর মহলের টনক নড়ল।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এনভায়রণমেণ্ট মিনিস্টার মিঃ হোয়েল, কোনরকম সময় নষ্ট না করে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটকে সব রকম দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অনুরোধ করেছেন সব রকম চেকআপের ভেতর দিয়ে এই রহস্যের কিনারা করতে।

ইউনিট ক্যাপটেন ডক্টর টেইলর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নিজের কাজে। এই শিপম্যান গ্রামকে কেন্দ্র করে পঁচিশ মাইল জুড়ে সমস্ত গ্রামবাসীর ওপর নোটিশ জারি করা হয়েছে,—তারা যেন এ অঞ্চলের মাটিতে উৎপন্ন কোন শাক শব্জি না খান।

সাধারণের যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গভ্মেন্ট অন্যান্য দূর অঞ্চল থেকে সব রকম খাদ্য যোগান দিয়ে যাবে। এই বিরাট অঞ্চলের সব মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে,—তারা যেন তাদের ইউরিন আর ব্লাড হেল্থ সেণ্টারে জমা দিয়ে যান। ব্যাপক পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে হবে,—এই আন্ত্রিক রোগের কারণ কি?

মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ভূ-বিজ্ঞানীদের দশজনের যে ইউনিটটা এখানে এসেছে, শ্রীনিবাসন ওদের সঙ্গেই কাজ করছেন। দক্ষিণ ভারতের পূর্ণমুলিতে জন্ম হলেও এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে কলকাতার ডঃ সোমের সঙ্গে বেশ মধুর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তার ফলে ভূ-বিজ্ঞানীদের সব খবরই তিনি পান শ্রীনিবাসনের কাছ থেকে।

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন শ্রীনিবাসন।

আসলে ডঃ সোমকেই খুঁজে বার করা তাঁর উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ আগে তাঁকে বাইরের দিকেই যেতে দেখেছিলেন শ্রীনিবাসন। মেডিক্যাল ওয়ার্ডটার ভেতরে এক চক্কর দিয়ে বাইরের লনে পড়তেই ডঃ সোমকে দেখতে পেলেন তিনি। বিকেলের সেই আগের জায়গাতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

—কি ব্যাপার বলতো সোম, বিকেল থেকেই দেখছি তোমার কেমন একটা ছাড়ো ছাড়ো ভাব! গোলমেলে কিছু ঘটেছে নাকি।

পাশে এসে দাঁড়ালেন শ্রীনিবাসন। তার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে চুপ করে রইলেন ডঃ সোম।

—কি হল কি? হোম সিক নাকি?

এবার না হেসে পারলেন না ডঃ সোম,—বেশ বলেছ যা হোক। আমি একটা অন্য কথা ভাবছি শ্রীনি।

—যেমন? বলে ফেল।

—বলছি। কিন্তু তোমার মুখের যা গম্ভীর চেহারা হয়েছে, তাতে আর বলতে ভরসা পাচ্ছি না।

গাম্ভীর্য আরো দ্বিগুণ হ'ল শ্রীনিবাসনের,—ভয়ের কিছু নেই। অভিজ্ঞ লোক বলে—ভয়েই ভ্রান্তি। মনের কথা খোলাখুলি না বলার ভুল নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে করবে না।

নিশ্চয়ই না।—একটু সময় নিলেন ডঃ সোম : দ্যাখো কৃষিজাত উৎপাদন থেকেই সমস্ত প্রাণীজগৎ তার দেহের রসদ সংগ্রহ করে। অতএব বলতে গেলে, মাটির গুণাগুণের ওপরেই ফসলের ভালমন্দ নির্ভর করে আসছে। সে মাটি যদি উর্বর না হয় তাহলে হয়ত তার কিছু ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে যদি এভাবে বিষাক্ত হতে শুরু করে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব পরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পারো?

হাসলেন শ্রীনিবাসন। পাউচ থেকে কিছুটা টোব্যাকো পাইপে ভরতে ভরতে বললেন,—এ নিয়ে আমরা যে কিছু চিন্তা ভাবনা করিনি এমন নয়। দ্যাখো সোম, তার জন্যে এই আমরা—মানুষরাই যথেষ্ট রেসপনসিবল। আমাদের ভারতবর্ষে মাটিকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সেই মা বেইমান! তিনি শেষ পর্যন্ত ফসলের ভেতর দিয়ে বিষ তুলে দেবেন মুখে,—না না এ আমি বিশ্বাস করি না।

—কিন্তু তোমাদের সার্ভে ইউনিট-ই তো বলছে—হাই এ্যামাউন্টস

অবদ্য পয়জনাস মেটাল ওয়াজ ইন দ্য সয়েল—

—বলছে। তবে তার আগে এটাও উল্লেখ কর,—দি ইউনিট সাসপেক্টস্ ! ইনভেস্টিগেশান্ ইজ গোয়িং অন। মতামতটা মিথ্যেও তো হতে পারে?

স্পষ্ট বিরক্তি এবার ডঃ সোমের মুখে,—কিন্তু দিনের পর দিন মানুষের অসুস্থ হয়ে পড়াটা তো আর মিথ্যে নয় শ্রীনি ?

—তা নয়। তবে ঈশ্বর না করুন, যদি তেমন দিন আসেই, আমি সবার আগে মানুষকে অপরাধী হিসেবে সনাক্ত করব। মানুষ তার কাজের ভেতর দিয়ে, নানাভাবে পৃথিবীর আকাশ-মাটি-জল সমস্ত বিষাক্ত করে তুলছে।

বলে কি যেন ভাবলেন শ্রীনিবাসন,—তুমি কোনদিন এই শিপম্যান গ্রামটার দক্ষিণ দিকটা ঘুরে দেখেছ ?

—না !

—সেইজন্যেই তুমি আমার কথাগুলো ঠিক নিতে পারছো না। তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জগতের সঙ্গে আমাদের জগতের কিছু তফাত আছে। হাতে সময় করে একদিন চলো না আমার সঙ্গে।—দেখলে বুঝবে।

নাকের ওপর থেকে চশমাটা নামিয়ে মুছতে মুছতে ডঃ সোম বললেন,—কিরকম ?

হাসলেন শ্রীনিবাসন,—মনে হচ্ছে আমারকথায় তুমি দুঃখ পেয়েছ। আসলে আমার কথা তুমি ধরতে পারোনি। তুমি মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে মানুষের শত্রুগুলোকে চিনতে চেষ্টা করো, কিন্তু আমার ধারা আলাদা। আমি মানুষের ভেতর দিয়ে মানুষের শত্রুতো বটেই, এমন কি গোটা জীবজগতের শত্রুকে আলোয় টেনে আনতে চেষ্টা করি।

—কি বলতে চাও তুমি ! মানুষের ওপর এমন মনোভাব কিন্তু সত্যিই ক্ষতিকর।

একটা জেদীভাব শ্রীনিবাসনের গলায়,—মানুষের লোভ মানুষের সমাজ ও পরিবেশের যতটা ক্ষতি করেছে, তার তুলনায় আমার মনোভাব কিছুই নয়। ঠিক আছে, কাল হাতের কাজগুলো সেরে রাখবার চেষ্টা করো, কাল তোমায় নিয়ে বেরোবো।

বলতে গেলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না শ্রীনিবাসন। সোজা নিজের বেডরুমের দিকে পা বাড়ালেন।

পরের দিন কিন্তু সময় করে উঠতে পারলেন না ডঃ সোম। সকাল থেকে

হেল্‌থ সেন্টারে রোগীর চাপ। সবারই প্রায় বদহজম আর পেট নিয়ে গোলমাল। তাছাড়া শিপম্যানকে কেন্দ্র করে পঁচিশ মাইল এলাকার মানুষের ব্লাড আর ইউরিন টেস্টের একটা চাপ আছে। ব্রেকফাস্টের পর লাঞ্চের সময় পাওয়াই ভার হয়ে উঠেছে। আন্ত্রিক রোগের ব্যাপক প্রসার ভাবিয়ে তুলেছে গোটা ইউনিটকে। শ্রীনিবাসন মাঝে মাঝে এসে দেখে গেছে। মুখ তুলে চোখে চোখ পড়তে একটু হেসেছেন সোম।

একদিন লাঞ্চের পর শ্রীনিবাসন এসে দাঁড়ালেন ডঃ সোমের চেম্বারে।—ডাক্তার আমার যতদূর ধারণা, গোটা শিপম্যান ভিলেজটাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব নিশ্চয় তোমার একার মাথায় কেউ চাপিয়ে দেয়নি! বাকি লোক-গুলোকেও কিছু করতে দাও।

তাঁরা যথেষ্ট করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডঃ সোমের জবাব।

—সেটাই তো উচিত। তাঁদের দেশ তাঁরা করবেন না? এখন ওঠো দিকি, বাকি দিনটা আমার রেস্টের মধ্যে, চলো, তোমায় রুরাল এরিয়াটা ঘুরিয়ে আনি।

উঠে দাঁড়ালেন ডঃ সোম,—হঠাৎ এমন ছুটি যে? কাজ কি শেষ করে ফেলেছ নাকি?

—ফেলেছি বইকি।

তাই নাকি! ভেরি গুড। কিন্তু কি পেয়েছো মাটিতে?—কৌতূহল ডঃ সোমের।

—বেশ ভাল জিনিসই পাওয়া গেছে। তবে তার পার্সেনটেজটা কতটা পরিমাণ মাটিতে মিশে আছে সেটা নিয়েই কর্তারা মাথা ঘামাচ্ছেন। আমি দেখলাম এটাই সুযোগ, দে চম্পট।

মৃদু হাসলেন ডঃ সোম,—ফাঁকিবাজ! ঠিক আছে, চলো।

হু হু করে ইউনিট বাসটা ছুটে চলেছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। রাস্তার পাশে নানারকম ফলের বাগান। বিশেষ করে আপেলের চাষটাই এ অঞ্চলে খুব বেশি বলে মনে হল ডঃ সোমের। মাঝে মাঝে বেশ ছোট ছোট জমাটি গ্রাম,—কটেজগুলোর মাথা ছাড়িয়ে ছোট ছোট চিমনির সারি। কোথাও কোথাও বা সামান্য ধোঁয়ার রেখা, এঁকে বেঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে।

দুপাশে এত যে ফলের বাগান দেখছ, এক সময়ে মদ তৈরি করে এ অঞ্চলের কিছু মানুষ বেশ পয়সা করেছিল—পথের দিকে নজর রেখে শ্রীনিবাসনের মন্তব্য।

—এখন আর করেনা?

—করে, তবে আগের মত নয়। আগে ওসব জিনিসের একটা মার্কেট ছিল এখানে। সেটা নষ্ট হয়ে যাবার পর 'সাইডার প্রডাকট্‌স' বলতে যা কিছু, সব ব্রিস্টলে চালান করতে হয়।

বাঁয়ে গাড়ি ঘোরালেন শ্রীনিবাসন। আবার চুপচাপ। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্রেক কষে দাঁড়াল গাড়িটা।

—নামো এখানে। এবার ভাল করে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলো দিকি, তোমার কি মনে হচ্ছে?—শ্রীনিবাসন গাড়ির বনেটের ওপর আনমনে আঙুল দিয়ে একটার ওপর একটা রেখা টানেন একের পর এক!

মাটিতে নেমে টান টান হয়ে সোজা হলেন ডঃ সোম। সামনে অসমতল মাটির বিরাট এক উন্মুক্ত প্রান্তর। এক পাশে সার সার কিছু বাড়িঘরের ভেঙে পড়া অস্তিত্ব। কয়েকটা বাড়ির দেয়াল যদিওবা দাড়িয়ে কিন্তু ছাদ বলতে খোলা নীল আকাশ। ক—বে ভেঙে গেছে। অন্যদিকে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা ফ্যাকটরির শেড-এর কাঠামো। কোথাও বা মরচে ধরা ভাঙা চিমনি শুয়ে আছে মাটিতে। হালফিল জায়গাটা অন্তঃসার শূন্য, শূন্যগর্ভ। তবে মনে হয়, এককালে জায়গাটা বেশ জমজমাট ছিল।

—এখানে এক সময়ে কারখানা বা ওই জাতীয় কিছু ছিল।

—কাছাকাছি গেছ, তবে পুরোটা বলতে পারোনি এটা হল একটা পরিত্যক্ত খনি অঞ্চল। এ ডিফাংট জিংক মাইনস। এটি যখন চালু ছিল, তখন বেশ কিছু লোক এখানে রুটি-রুজি করে খেত। এই খনিটাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল আশপাশের গ্রামগুলোর ইকনমি। তুমি তো জান, সব সম্পদেরই একটা শেষ আছে। মাটির নীচের ধাতু ভাণ্ডার যেদিন শেষ হয়ে গেল;— মাইন ওনার ইন্ডাসস্ট্রিয়ালিষ্টরা আর ফিরেও তাকালো না এই এলাকাটির দিকে। তারা চলে গেল, যাবার আগে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে গেল বিষ।

—বিষ!

—হ্যাঁ, বিষ।

চোখ দুটো যেন হঠাৎ তীক্ষ্ম হয়ে উঠল শ্রীনিবাসনের,--যতদিন ধরে খনিটা চালু ছিল, ততদিনকার ওয়েষ্ট মেটিরিয়াল বলতে যা বোঝায়, তা এখানে ফেলে রেখে চলে গেল খনি-মালিকেরা। সেই সব জঞ্জাল ক্রমশঃ রোদ বৃষ্টি কুয়াশায় মাটির সঙ্গে মিশে, আজ তার বিষক্রিয়া শুরু করেছে। তুমি শুনলে অবাক

হবে সোম,—এখানকার মাটিতে যে শাকশব্জি ফল মূল ফলে' তার সবগুলোই মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এক জাতীয় পয়জনাস মেটালের সংমিশ্রণ আমাদের মাটি পরীক্ষায় ধরা পড়েছে।

—পয়জনাস মেটাল! কি রকম?

—ক্যাডমিয়ম। পার্স পার মিলিয়ন' মানে বোঝ তো? এক লক্ষ মূল পদার্থের অণুতে যত পরিমাণ অন্য পদার্থের অণু মিশে থাকে, সেইটাই হল শেষের পদার্থটির পরিমাণ—পার্স পার মিলিয়ন। ক্যাডমিয়মের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এক পার্স পার মিলিয়ন। এখানে সেইটির অনুপাতই দাঁড়িয়েছে কুড়ি পার্স পার মিলিয়ন। সুতরাং—

বলো কি?–অবাক বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যান ডঃ সোম।

—হ্যাঁ। পুরনো নথিপত্র থেকে আমরা পেয়েছি,—দীর্ঘ দশ বছর ধরে পরীক্ষা চালিয়ে ন্যাশনাল সার্ভে অব ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস-এর তরফ থেকে ইম্পিরিয়াল কলেজ এ তথ্য প্রচার করেছিল। এখন বলো, মাটির এই সিরিয়স কন্টামিনেশনের ব্যাপারে তুমি কাকে দায়ী করবে?

ডঃ সোম কিছু বলার আগেই শ্রীনিবাসন বলে চলেন,—খনির মালিকরা শুধু নিজেদের রেভিনিউ-এর দিকে নজর রেখে কাজ করে গেছে। দীর্ঘদিনের আবর্জনা সব খনি অঞ্চলের চারপাশে পাহাড় প্রমাণ জড়ো করে রেখে গেল। কিন্তু ওগুলোকে শোধন করে যদি অন্য কোন কাজে লাগাবার চেষ্টা করতো, তাহলে নিশ্চয়ই আজকের মারাত্মক অবস্থায় এসে পৌঁছত না গ্রামগুলো।

একটা কিছু রহস্য অনুমান করেছিলেন ডঃ সোম, কিন্তু সেটি কি জাতীয় তার কোন হদিশ জানা ছিল না তাঁর। এখন শ্রীনিবাসনের কথায় তাঁর চোখ খুলে গেল। একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ডঃ সোম।

শ্রীনিবাসন আবার মুখ খোলেন,—আজ গভর্নমেন্টের এনভায়রণমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এ নিয়ে কতটা মাথা ঘামাচ্ছেন, তা তুমি বেশ জানো, কিন্তু ওদের অনেক আগেই উচিত ছিল না কি, এ ব্যাপারে একটা স্টেপ নেওয়া?

শেষের দিককার কথাগুলো আর ভালভাবে মাথায় ঢুকছিল না ডঃ সোমের। একটা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার ঝড় মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। একটার পর একটা ব্লাড আর ইউরিন টেস্টের রিপোর্ট চোখের ওপর ভেসে উঠছে। মজা এই, সব রিপোর্টগুলোই প্রায় এক রকমের।

—তুমি কি এখন ফিরতে পারবে শ্রীনি? আমি এখুনি হেলথ সেন্টারে

ফিরতে চাই।

কি ব্যাপার, কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেল নাকি?

—না—না, তোমার কথায় আমার একটা কথা মাথায় স্ট্রাইক করল। টেস্ট রিপোর্টগুলো নতুন ভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

অগত্যা।—গাড়ির দিকে ফিরে চলেন শ্রীনিবাসন।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন ডঃ সোম। কোনোদিকে না তাকিয়ে ডঃ সোম টেস্ট রিপোর্টের ফাইল নিয়ে বসলেন। নিরবিচ্ছিন্ন কাজে মগ্ন ডঃ সোম। প্রতিটি রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখছেন। অন্যান্য সহকর্মী কথা বলতে এসে ফিরে গেছেন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে; ক্রমশঃ রাত গভীর হয়। অনেক পরে একটা তীব্র কথা কাটাকাটি ডঃ সোমের কানে এল। খেয়াল করতে কানে এল এনকোয়ারি ক্লার্কের গলা—হ্যাঁ, ওঁর নাম ডঃ সোম। উনি এখন ভীষণ ব্যস্ত।

—কিন্ত আমার প্রয়োজনও ভীষণ জরুরী। তুমি কি একবার তাঁকে ডেকে দিতে পারোনা?

—পেশেন্টের এ্যাডমিশন হয়ে গেছে। এখন আপনি বাড়ি যেতে পারেন মিঃ থেইরি। ব্যক্তিগতভাবে উনি এখন কারো সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না।

মিঃ থেইরি! ফাইল রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডঃ সোম।

—কি ব্যাপার, আপনি!

—গুড ইভনিং ডকটর। আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

তারপরেই হঠাৎ মিঃ থেইরির মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমায় ক্ষমা কর ডকটর! তোমায় সেদিন অনেক বিরক্ত করেছি।

—না—না, ঠিক আছে! ওসব কথা ভাববেন না, কিন্তু এ সময় এখানে? কিছু দরকার ছিল কি?

—না, ধন্যবাদ। তেমন কিছু নয়—

বলে সঙ্কোচে পিছু ফিরতে চাইল মানুষটি। পাশ থেকে এনকোয়ারি ক্লার্ক বললেন—একটা বাচ্চা মেয়েকে হেলথ সেন্টারে এ্যাডমিশনের জন্যে এনেছিলেন।

বাচ্চা মেয়ে! কে হয় আপনার? উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন ডঃ সোম।

—আমার নাতনি! কদিন থেকেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল,—আজ একেবারে—

ভেঙে পড়লেন থেইরি। ডঃ সোমের মুখের দিকে তাকিয়ে এনকোয়ারি ক্লার্ক বললেন—নতুন কিছু নয়। এ্যাকিউট স্টমাক ট্রাবল।

তাই নাকি? কোন্ ওয়ার্ডে আছে?—বলে পিছু ফিরতেই মিঃ থেইরি বললেন,—তুমি পার্সোনালি একটু দেখো ডকটর। ওটার আবার মা নেই। ভালমন্দ যদি কিছু ঘটে, তাহলে আমার ওটাকে নিয়ে এতকাল ঝক্কি পোয়ানো একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে। প্লীজ—

কোন জবাব না দিয়ে ডঃ সোম সোজা ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে পা চালালেন।

পরেরদিন সকালে মিঃ থেইরি আবার এসে হাজির হলেন হেল্থ সেণ্টারে। চোখেমুখে বেশ একটা চিন্তার ছায়া। ডঃ সোম তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন,—বেচারির সারারাত দুচোখের পাতা এক হয়নি।

—গুড মর্নিং ডকটর! মেয়েটার খবর কি?

—ভালই। কেসটা ইউনিট ক্যাপটেন ডঃ টেইলর নিজেই টেক আপ করেছেন।

কেমন যেন গুম মেরে রইলেন মিঃ থেইরি। বেশ খানিকটা পরে বললেন, —আগে তোমার কথা শুনলে, এত ঝামেলায় পড়তে হতো না ডকটর!

একটা অনুশোচনার ভাব তাঁর মুখে দেখতে পেলেন ডঃ সোম। সান্ত্বনার সুরে তিনি বললেন,—সে কথা ঠিক নয় মিঃ থেইরি। রোগটা হঠাৎ একদিনে আসে নি। অনেক দিন ধরেই এর কারণ ওর শরীরে একটু একটু করে জমা হচ্ছিল।

কিন্তু কিভাবে? আমি ওর যত্নের কোন ত্রুটি করিনি।

—ফ্রুটস এণ্ড ভেজিটেবল্সের ভেতর দিয়ে ওর শরীরে বিষ ঢুকে গেছে।

—হ্যাঁ, ঠিক এইরকম কথাই সেদিন যেন তুমি বোঝাতে চেয়েছিলে। কিন্তু এমন এ্যাবসার্ড কথা আমি ভাবতেই পারি না ডকটর, মাটি—মাটি কি করে পয়জনাস হয়?

শুনে গম্ভীর হলেন ডঃ সোম। রাতজাগা মানুষটির অসহায় প্রশ্নের জবাবে বললেন,···হয় মিঃ থেইরি। মানুষের লোভ স্বেচ্ছাচার কর্তব্যহীনতায় মাটিও কখনো কখনো বিষাক্ত হয়! সেও বোধহয় প্রতিশোধ নেয় এই ভাবেই।

তবে আগে যখন আমরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলাম, তখন জানতাম না আসলে বিষটা ঠিক কি জাতের। এখন আমাদের ইউনিট সেটা ডিটেক্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এবং সেটা শরীরের পক্ষে মারাত্মক।

—কি সেটা ?

—ক্যাডমিয়াম !

মিঃ থেইরির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন ডঃ সোম, কিছুই মাথায় ঢোকে নি তাঁর। তাই প্রাঞ্জল করেন তিনি,—ক্যাডমিয়ম হল এক জাতের ভারী ধাতু। যার সঙ্গে মিশে আছে কিছুটা পারদ আর সীসে।

বলকী !—আঁতকে ওঠেন বৃদ্ধ থেইরি। এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে তাঁর কাছে।

হ্যাঁ। আজকের ইলেকট্রনিকস যুগে এই মেটালটা দিয়ে তৈরি হয় না এমন জিনিস নেই। ব্যাটারি, টি. ভি. পার্টস ইলেকট্রনিক পার্টস ছাড়া আরো অনেক কিছুই তৈরি হয় এ দিয়ে।

সে যাই হোক,—অসহিষ্ণু প্রশ্ন মিঃ থেইরির : তুমি তো মাটির ব্যাপারে কথা বলছিলে। আমাদের শরীরে সেটা আসবে কি করে ?

খুব সহজে। গাছ মাত্রই মাটি থেকে রস নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করে, ফসল দেয়। কিন্তু মাটির জলীয় অংশ যেখানে দূষিত, সেখানে এগ্রিকালচারাল প্রোজেক্টস্ মাত্রই পয়জনাস হতে বাধ্য। আর এ অঞ্চলের মানুষ নির্বিচারে সেই বিষ গলধঃকরণ করে নিজের অজান্তে ডেকে এনেছে অসুস্থতা।

এ্যাঁ !—বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে মিঃ থেইরির।

—হ্যা, আসলে আপনারা জানেন না, কি ভাবে আপনারা একটু একটু করে নিজেদের অসুস্থ করে তুলছেন ! দীর্ঘদিন ধরে এই বিষ খাবারের মধ্যে দিয়ে পেটে জমা হতে থাকে, যার আলটিমেট রেজাল্ট এই কীডনি ট্রাবল। এ ছাড়া আরো একটা কথা,—গোটা শীতকালটা ফায়ার প্লেসে আপনারা ওইসব গাছের ডালই পুড়িয়ে এসেছেন। ফলে সেই ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গিয়ে আপনাদের ফুসফুসকেও কমজোরি করে তুলেছে। অতএব—

আর কিছু বুঝতে বাকি থাকেনা মিঃ থেইরির। নিজের অসহায় অবস্থাটা তাঁকে ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। আশঙ্কায় ভারী হয়ে আসে তাঁর স্বর। বিপন্ন

আর্তি তাঁর গলার স্বরেও ফুটে ওঠে,—ডকটর, তুমি কি বল, মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো তো ?

—ও—সীওর। উই মেডিক্যাল মেণ আর হিয়ার, কোন অবস্থাতেই আমরা আশা ছাড়িনা। এই ক্রাইসিস্ কাটিয়ে ওঠার সব রকম প্রিকশান আমরা নিয়েছি। ডোন্ট উর্ওরি। গুড্ নাইট্। আপনি নিশ্চয়ে বাড়ি যান।

ডঃ সোমের শরীরটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল করিডোরের বাঁকে। থেইরি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে।

ব্রেন কন্ট্রোল

মাথার ওপর ঘুরতে থাকা পাখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সাব-ইনস্পেক্টর মিঃ পাটোয়ারি বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন, ভবতোষবাবু খুন করেন নি?

—না, সে কথা আমি একবারও বলি নি। মহাজন জবাব করলেন, তাছাড়া আমার বলাবলিতে কি আসে যায়? সে মানুষ নিজেই স্বীকার করেছেন, বিকাশ মিত্তিরকে তিনি গলা টিপে হত্যা করেছেন। কিন্তু—

—এর পরে আর কিন্তু কি স্যর! আমরা পুলিশের লোক, অপরাধীর স্বীকারোক্তি আমরা পেয়েছি। তা ছাড়া আছে প্রত্যক্ষদর্শীর স্টেটমেন্ট। এর পরেও যদি অন্য কিছু প্রসঙ্গ এনে ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলেন, তা হলে আইনগত দিক থেকে আদালত আর নিজেদের বিরত করা হয় না কি?

স্পষ্ট অভিযোগ। হাজার হলেও অফিসার ইনচার্জ। মহাজনের মুখে বিরক্তি দেখা দিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ পাটোয়ারি, হঠাৎ আমার ওপর আপনার আস্থা এত কমে যাওয়ার কারণ কি?

সঙ্গে সঙ্গে থুতনিটা কণ্ঠার কাছে নেমে এলো মিঃ পাটোয়ারির, আমায় মাফ করবেন, আমি সে'রকম কিছু ভেবে কথাটা বলি নি। তাহলে আপনার কথাই রইল, আজ সন্ধ্যায় ডঃ অবিনাশ মিত্তিরেরবাড়িতে আমি হাজিরথাকছি।

—হ্যাঁ। বমাল সমেত। সহজ হাসি আবার দেখা দিল মহাজনের মুখে, যদিও আপনার আগে আমিও সেখানে হাজির থাকবো।

উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পাটোয়ারি, বমাল সমেত! ঠিক বুঝলাম না স্যর।

—আরে বসুন, বসুন। আমাদের ঝামেলা তো সেই সন্ধ্যেয়।

মিঃ পাটোয়ারির কথার জবাব দিলেন না মহাজন। পাটোয়ারি চেয়ার নিতে মুখ খুললেন তিনি, আচ্ছা, ভবতোষকে আপনি তো বেশ ভালভাবেই দেখেছেন, ফ্রম দ্য কোর অফ ইয়োর হার্ট বলুন তো, সে কি সত্যিই বিকাশ মিত্তিরকে গলা টিপে মারার ক্ষমতা রাখে? দেহ কিম্বা মনের দিক থেকে

সত্যই সে কি এতটা সবল ?

একটু সময় নিলেন মিঃ পাটোয়ারি। চোখের ওপর ভেসে উঠল ভবতোষবাবুর ঝাঁটার কাঠির মাথায় আলুর দম মার্কা চেহারা চোয়াল বসা, কোটরাগত দু'টো চোখ।

—কিন্তু স্যর—

—কিন্তুর কথা তো আগেই বলেছেন। ভবতোষবাবু যে খুন করেছেন এটা ঠিকই। তবে কেন, কিজন্যে তিনি এমন কাজ করলেন, সেগুলো খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছেন কি ? পুরনো কোন রাগ বা দ্বেষ মনে থাকলে, কিম্বা ধরুন বিকাশ মিত্তিরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে নিজে বেনিফিটেড হবার আশা যদি কিছু থাকে, তবেই না সে মানুষটা অমন বাজে কাজের ঝুঁকি নেবেন ?

অস্বীকার করার উপায় নেই মিঃ পাটোয়ারির।

— বেশ, মহাজন বললেন, এখন বিকাশ মিত্তিরকে খুন করে; ভবতোষ বাবু কতটা বেনিফিটেড হতে পারেন খতিয়ে দেখা যাক। ভবতোষবাবুর বাবারা হলেন তিন ভাই। বড় বিকাশবাবু কোন ছেলেপুলে নেই। খুন হবার পর তার তরফে আছেন শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী। মেজকর্তা মহীতোষ মিত্তির, বেশ কয়েক বছর আগে সস্ত্রীক গত হয়েছেন। তাঁরই একমাত্র রুগ্ন সন্তান হলেন ভবতোষ মিত্তির। ও বাড়ির ছোট কত্তা, ডঃ অবিনাশ মিত্তির। এবার বিচারে বসা যাক। ওয়ারিশনের দিক থেকে আমরা তিনটে খুঁটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বিকাশবাবু, ভবতোষ আর ডঃ অবিনাশ মিত্তির। বাড়ির বহুকালের পুরনো চাকর শশী পুলিশের কাছে বলেছে, সে নিজের চোখে ভবতোষবাবুকে দেখেছে, বিকাশবাবুকে গলা টিপে মারতে। তখন মাঝরাত্তির। বড়বাবুর ঘরের বাইরের দালানেই সে শুত। আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভাঙতেই সে ঘটনাটা দেখে। বেশ—

একটু থামলেন মহাজন, রহস্যময় চোখে তাকালেন মিঃ পাটোয়ারির দিকে, তা হলে দেখা যাচ্ছে, তিনটি খুঁটির একটি গেল অপঘাতে, আর একটি যেতে বসল অপরাধে। এখন বলুন, এবার আইনআদালত পর্বগুলো যদি যথাযথ চলে, আলটিমেট বেনিফিটেড হবে কে ? জবাব দিন।

— ডঃ অবিনাশ মিত্তির। কিন্তু তার মতো মানুষ—

—এগ্জ্যাক্টলি, তাঁর মতো মানুষ। এবার তাহলে দেখা যাক, তিনি কেমন মানুষ ? ডঃ অবিনাশ মিত্তির, একজন মনের ডাক্তার। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ভিয়েনার ইউনিভার্সিটি ঘুরে,অনেক বড় বড় খেতাব নিয়ে কলকাতায়

ফিরে চেম্বার আর নার্সিংহোম খুলেছেন। আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির হেন সরঞ্জাম নেই, যার অভাব আছে তাঁর ভাণ্ডারে। কলকাতায় তাঁর সুনাম প্রচুর এবং ভারতে তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি একটা কিম্বদন্তী। আশা করি এতদূর পর্যন্ত আমি কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলি নি। কি মিঃ পাটোয়ারি ?

—না।

—বেশ, তাহলে এতদূর পর্যন্ত সকলেরই জানা। কিন্তু মনের খবর কে জানতে পারে ? আলোর নিচে যেমন অন্ধকার, খ্যাতির পেছনেও তেমনি থাকে আরো পাবার ঈপ্সা। আমার মতে সেটা অন্ধকারেরই সামিল। সেই অন্ধকারের খবর কে জানতে পারে ?

—আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন ? মিঃ পাটোয়ারি যথেষ্ট বিভ্রান্ত।

—আমি বলতে চাইছি, ভবতোষ মিত্তিরকে পাকাপাকিভাবে অভিযুক্ত করার আগে, সমস্ত দিক ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। আমার নীতি আপনি জানেন, সব রকম দিক বিবেচনা করে স্থিরনিশ্চিত হয়েই আমি চার্জশীট তৈরি করি। ভবতোষবাবুর ব্যাপারে আমি এখনো সে সিদ্ধান্তে পেঁছতে পারি নি। দেখা যাক, সন্ধ্যে পর্যন্ত ডেভেলপমেণ্ট কতদূর এগোয়।

— বলছেন কি ?

—হ্যাঁ। আর আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এসব নিয়ে আজ রাত পর্যন্ত কারো কাছে মুখ খুলবেন না।

—হঠাৎ এর'কম কথা ! কিছুটা ক্ষুণ্ণ মিঃ পাটোয়ারি।

হাসলেন মহাজন, যদিও সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট নিশ্চিন্ত। তবু বললাম, কারণ অধিকন্তু ন দোষায়। আমি একটা মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার ইনফরমার নিত্যানন্দকে নিশ্চয় মনে আছে আপনার, সে তার পাত্তা করেছে। শুধু কায়দা করে তুলে এনে, আপনার জিম্মা করে দিতে পারলেই হয়। আর সে সেটা পারবেই। অতএব আজ সন্ধ্যায়, ডঃ অবিনাশ মিত্তিরের চেম্বারেই মোষ্ট প্রব্যাবলি আমি আপনাদের কাছে বিশদ হতে পারব।

—বুঝলাম।

—তবে হ্যাঁ তার আগে ইচ্ছে করলে আপনি জেল হাজতে গিয়ে, ভবতোষ-বাবুর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে পারেন। এমনো হতে পারে, আমরা আরো নতুন কিছু সূত্র পেতে পারি।

—বেশ। আমি সে চেষ্টাই করছি।

মিঃ পাটোয়ারি যখন জেল হাজতে পৌঁছলেন, তখনো তিনের ঘরে ছোট কাঁটা গিয়ে পৌঁছয় নি। সিপাহী গরাদের কাছ বরাবর এসে ফিরে গেল। মিঃ পাটোয়ারি দু'চারটে এটাওটা কথার পর, একেবারে কাজের কথায় চলে গেলেন। অত্যন্ত নরম গলায় বললেন, ভবতোষবাবু, একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না, জবাব দিতে পারেন?

মুখ তুললেন ভবতোষ।

– হাজার হলেও বিকাশবাবু আপনার জ্যাঠামণি। কি এমন অপরাধ তাঁর, যার জন্যে তাঁর ওপর আপনি ওভাবে চড়াও হলেন!

একটা ভাবলেশহীন চাউনি ফুটে উঠল ভবতোষবাবুর চোখে। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা অনুশোচনা মাখা গলায় তিনি বললেন, আমারো মাথায় ঢোকে না। হঠাৎ কেনই বা আমি এ কাজ করলাম। মাঝে মাঝে খিটিমিটি, কথা কাটাকাটি কখনো হয় নি জ্যাঠামণির সঙ্গে এমন নয়, তা বলে অমন ঘটনা আমার হাত দিয়ে হয়ে যাবে, আমি কখনো ভাবি নি।

চুপ হলেন ভবতোষ। মিঃ পাটোয়ারি এগিয়ে চললেন, তা হলে বিকাশবাবুর সঙ্গে আপনার খিটিমিটি ছিল? কিন্তু কি নিয়ে? অবশ্য যদি বলতে কোন বাধা না থাকে।

—না, বাধা কিসের? একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন ভবতোষ, তবে সে সব ব্যাপারের পর অনেক দিন কেটে গেছে। আমার মনেও কোন রাগদ্বেষ ছিল না।

—তবু, ঘটনাটা কিরকম?

—কাকামণি চেয়েছিলেন, বাড়ির পিছনের বাগানের জায়গায় একটা নতুন বাড়ি তুলতে। নার্সিং হোম করবেন বলে।

—কাকামণি, অর্থাৎ ডঃ অবিনাশ মিত্তির? কোন ফাঁক রাখতে চান না মিঃ পাটোয়ারি।

—হ্যাঁ। বাড়িটা যখন ভাগ হয়, কাকামণি ডাক্তার মানুষ বলে সামনের অংশটা ওনাকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে পিছনের বাগানটা আমার বাবা আর জ্যাঠামণির ভাগে বর্তায়। বাবা নেই, কাকামণি আমার কাছে প্রস্তাব দিলে, আমি রাজি হই। কিন্তু জ্যাঠামণি কিছুতেই রাজি নন, বাড়ির পিছনটাকে এমন পাগলাগারদ করে তুলতে।

মিঃ পাটোয়ারি কিছুটা আলোর দেখা পেলেন। মনে পড়ল মহাজনের কথা।

– ঠিক, কথা, বাড়ির লাগোয়া পাগলাগারদ তৈরি হোক, এ খুব কম

লোকই পছন্দ করেন। কিন্তু আপনি কাকামণির কথায় রাজি হয়েছিলেন কেন, ভয়ে?

—না-না। ভয় কিসের? ভয় দেখিয়ে কিছু করার মানুষ উনি নন। তা ছাড়া, আমায় উনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন চেহারা। চিরকালই রুগ্ন। ছোটবেলায় রিকেট হয়েছিল, তারপর এত বছর বয়েস পর্যন্ত কখনো ভাল থাকি নি। কাকামণির জন্যেই তবু কিছুটা সুস্থ থাকি।

—তা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল, নার্সিং হোম করার?

—কিছুই না। কাকামণি প্রথম কিছুদিন খুব রাগ করেছিলেন। পরে বললেন, কি আর করা যাবে, দাদার যখন ইচ্ছে নেই, তখন ও প্ল্যানিংটা বন্ধই করে দিলাম রে। তা এসব বছর দুতিন আগেকার কথা। সেই সময় জ্যাঠামণির সঙ্গে দু-একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

—ও। একটু থেমে আবার মিঃ পাটোয়ারি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, যেদিন রাত্রে আপনি বিকাশবাবুর ওপর চড়াও হন, সেদিন সন্ধ্যায় আপনি কোথায় গিয়েছিলেন বা কি করেছিলেন কিছু মনে আছে?

হাসলেন ভবতোষ, না থাকার কি আছে? সাধারণত এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়তে আমার কখনো ভালো লাগে না। তাই সন্ধ্যেবেলাটা চিরকালই কাকামণির চেম্বারেই থাকি। রাত্তিরে কাকামণি যখন ওপরে উঠে যান, আমিও তার সঙ্গে উঠে যাই।

উঠে পড়লেন পাটোয়ারি। ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উত্তেজিত। জেল অফিস থেকেই টেলিফোন করলেন মহাজনকে, ঈপ্সার অন্ধকার কিছুটা নজরে পড়েছে। কিন্তু ভবতোষবাবুর রেহাই কোথায়? তিনি তো এখনো পর্যন্ত নিজের অপরাধ কবুল করছেন।

রিসিভারে মহাজনের জবাব শুনতে পেলেন তিনি, কাউকে রেহাই কিম্বা ঝুলিয়ে দেওয়ার ভার তো আমাদের ওপর নেই মিঃ পাটোয়ারি। সে ভার আদালতের। আমরা পুলিশ, প্রকৃত অপরাধীকে বিচারকের সামনে তুলে ধরাই আমাদের কাজ।

খবর পাঠিয়ে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর ডঃ মিত্তির তাঁর ক্লোজড্ চেম্বার থেকে মুখ বাড়ালেন, আপনাকে কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। বুঝতেই পারছেন।

—না-না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওয়েটিংরুমে অপেক্ষমান মানুষগুলির

ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহাজন বললেন, হাতের কাজ সারুন। আজ আবার আমাদের একটু বেশি সময় দিতে হবে।

—তাই নাকি! আ-চ্ছা।

ডঃ মিত্তিরের মুখ দরজার আড়ালে চলে গেল। বসে আছেন মহাজন। আশপাশের অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ তাঁর ওপর। সেণ্টার টেবিলের ওপর থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলেন। ঠিক তার পরেই নিত্যানন্দ ঘরে ঢুকল। মহাজনের পাশের সোফাটায় বসে ফিস ফিস করে উঠল, মিঃ পাটোয়ারি এসে গেছেন।

—আমার এক নম্বরকে আনা হয়েছে তো?

—হ্যাঁ। পাটোয়ারির জিম্মায়। কিন্তু দু-নম্বরকেআনা সম্ভব হলো না।

—কেন? অপ্রসন্ন মহাজন।

—যাই বলুন, আনা সম্ভব নয়। একেবারে বেহাল। হাঁপানির টান এত বেড়েছে যে আনলে আমরাই বিপদে পড়ব। তবে আমাদের যাতে অসুবিধে না হয়, সমস্ত পয়েণ্টের ওপর তিনি বিরাট নোট দিয়েছেন, আপনাকে দেবার জন্যে! বলেছেন—এখন এতেই কাজ হবে। পরে উনি তো আছেনই।

—হুঁ। গম্ভীর হলেন মহাজন।

এক এক করে ঘর ফাঁকা হতে অনেকটা সময় নিল। এক সময় ডঃ অবিনাশ মিত্তির বেরিয়ে এলেন তাঁর ক্লোজড ডোর চেম্বার থেকে, আর ভালো লাগে না। নিত্য নৈমিত্তিক রুটিন। ইনি কে?

সোজা চোখ গিয়ে পড়ল নিত্যানন্দের ওপর। মহাজন বললেন, আমার সহকারী বলতে পারেন। তারপর কথারমোড় অন্যদিকে ঘুরিয়েদিলেন,কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমরা বেশ ধোঁকায় পড়ে গেছি বলতে পারেন। যে কারণে আপনার কাছে ছুটে আসতে হল।

—সেটা বুঝতেই পেরেছি। ডঃ মিত্তির সোফায় এলিয়ে দিলেন নিজেকে, ভবতোষের কথা মনে হলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ওর জন্যে আমি যথেষ্ট সময় দিতে পারি। আপনি আরম্ভ করুন।

—আশ্বস্ত হলাম। নড়েচড়ে বসলেন মহাজন, আপনাদের বহুদিনের পুরনো চাকর শশীর স্টেটমেণ্ট আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে।

—শশীর স্টেটমেণ্ট! কিরকম?

—শশী বলেছে, ভবতোষবাবু বিকাশ মিত্তিরকে গলা টিপে হত্যা করেছেন,

সে সেটা নিজের চোখে দেখেছে।

—হ্যাঁ, সেটা আমি জানি এবং ভবতোষের বিরুদ্ধে ওটা মারাত্মক।

—হ্যাঁ। কিন্তু তার থেকেও মারাত্মক, তার পরের মন্তব্য। সেগুলোর ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করে যদি চার্জশীট তৈরি করা যায়, তাহলে হয়তো ভবতোষ বাবুর গুরুদণ্ড কিছুটা কমতে পারে।

—তাই নাকি? বহুদিনের পুরনো লোক তো? বলুন, একটা ভাল কাজ করেছে! বলে সোজা হয়ে বসলেন ডঃ মিত্তির।

—হ্যাঁ, ও বলেছে—মহাজন তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। শশীর মন্তব্য ভবতোষবাবুকে সে জন্ম ইস্তক দেখে আসছে, কিন্তু কখনো তাঁকে সে রাগতে দেখে নি। গলা টিপে হত্যা করা তো অনেক দূরের কথা। একটা মানুষের রেগে উঠতে শরীরে যে ক্ষমতা থাকা দরকার, ভবতোষবাবুর সে শক্তিই শরীরে ছিল না কোন দিন।

—বাজে কথা। ক্ষীণজীবী দুর্বল মানুষই বরং যত কাণ্ড করে বসে রেগে গিয়ে। প্রতিবাদ করলেন ডঃ মিত্তির।

—ঠিক। মহাজনের যুক্তি, রাগতে পারে, কিন্তু শরীরে প্রতিকার করার ক্ষমতার অভাবে ভেতরে ভেতরে গর্জায়। আর যদিও বা বেপরোয়া হয়, তা হলে পিছন থেকে, কিম্বা লোক লাগিয়ে সে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। গলা টিপে মারার দৈহিক ক্ষমতা সে মানুষের আসবে কোথা থেকে?

– পার্টলি মেনে নিচ্ছি, এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্য কি?

শশী বলেছে, মহাজন এগিয়ে চললেন, ছোটবেলায় দারুন রিকেটে ভোগেন ভবতোষবাবু, আপনি তাঁকে সুস্থ করেছেন। পর পর বার তিনেক টাইফয়েড হয় বছর সাতেকের মধ্যে, তাও আপনি ভাল করেছেন।

- করেছি।

—তারপর থেকে আজ পর্যন্ত উনি আপনার চিকিৎসাতেই দাঁড়িয়ে আছেন।

—আছে।

—এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, একজন মানুষকে খুন করার মতো দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা তাঁর এলো কোথা হতে?

—স্ট্রেঞ্জ! ডঃ মিত্তিরের চোখে বিস্ময়, আমি মনের রোগের ডাক্তার ঠিকই, কিন্তু কার-কোথায়-কখন চিত্ত বিকলন হচ্ছে এবং কি কারণে, তার ডিটেকশন কি

আমার পক্ষে সম্ভব ?

—অন্ততঃ আপনার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব। বাম দিকে হেলে পড়ে তির্যক চোখে তাকালেন মহাজন। পুলিশের সদর দপ্তর ভবতোষবাবুর মেডিক্যাল চেক আপ করে কিন্তু অন্য রিপোর্ট দিচ্ছে।

—যেমন ?

—দেখা গেছে, ভূমিকম্পের আলোড়নের মতো ভবতোষবাবুর মগজে একটা আক্রমণাত্মক সেনসেশন মাথা চাড়া দিয়েছিল সেই সময়।

—স্বাভাবিক ! না হলে গলা টিপতে যাবে কেন সে ? সমর্থন করলেন ডঃ মিত্তির।

—কিন্তু অস্বাভাবিক হলো, রিপোর্টে বলছে দ্যাট ইজ ক্রিয়েটেড বাই সামবডি এলস।

—ইজ ইট পসিবল ? আকাশ থেকে পড়লেন ডঃ মিত্তির।

—পসিবল। আমাদের বিজ্ঞান বিভাগ ভবতোষবাবুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছে, সেটা হলো ভবতোষ বাবুর মস্তিষ্কের কেন্দ্রের ধূসর স্নায়ুকোষ সমষ্টিতে, আই মীন, সেনট্রাল গ্রে পোরশনে তড়িৎ-প্রবাহ সংক্রামিত করে তাকে উত্তেজিত করা হয়েছিল।

মহাজন দেখলেন, অবাক বিস্ময়ে ডঃ মিত্তিরের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারপর ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন, আপনাদের পুলিশেও বিজ্ঞান বিভাগ শেষ পর্যন্ত ভবতোষ সম্বন্ধে ওই সিদ্ধান্তে পেঁাচেছে ! খুব ভাল, একেই বলে এ্যাবসার্ড ইমাজিনেশন। আর কি কি বলেছে জানতে পারি ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। উঠে দাঁড়ালেন মহাজন ? কিছুক্ষণ আগে নিত্যানন্দর দেওয়া কাগজটা প্যান্টের পকেট থেকে বার করে একবার ঝালিয়ে নিলেন। এতে বলা হয়েছে, যে কোন ঠাণ্ডা মাথার মানুষকে উত্তেজিত করে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ নিজের উদ্দেশ্য সফলের কাজে লাগাতে পারেন। যদিও আমাদের দেশে এমন ঘটনা বিরল, কিন্তু অসম্ভব নয়। আর এরকম যে করা যায়, তার রেফারেন্সে বলা হয়েছে, বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হেস 1932 সালে এটা পরীক্ষা করে দেখিয়ে গেছেন, মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ধূসর স্নায়ুকোষ সমষ্টিতে অর্থাৎ সেনট্রাল গ্রে ম্যাটারকে রেডিও মারফৎ উত্তেজিত করে যে কোন ঠাণ্ডা স্বভাবকেও আক্রমণাত্মক করে তোলা যেতে পারে।

ডঃ মিত্তিরের চোখ দুটো কুঁচকে গেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মহাজনের মুখের দিকে। মহাজন বলে চললেন, তেমনি আবার স্বভাব-রাগী সবলের মস্তিষ্কের caudate nucleus জায়গাটাতে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে সে মানুষটাকে ঠাণ্ডা নিরীহও বানিয়ে দেওয়া সম্ভব। ভবতোষবাবুর মেডিকেল চেক আপ রিপোর্ট বলছে—

—আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, কে এ কাজ করতে পারে?

—আপনি।

—আমি! বাট হোয়াই? চিৎকার করে উঠলেন ডঃ মিত্তির।

—শুধুমাত্র এক কাজে দুটি মানুষকে সরিয়ে আপনাদের বাড়ির পেছনের বাগানটার অধিকার পাবার স্বার্থে।

—অ-ফি-সা-র?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মহাজন। ঈঙ্গিত পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিত্যানন্দ। মহাজন হাত কয়েক দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ডঃ মিত্তিরের মুখোমুখি, আমার কাছে খবর আছে অবনী ঘোষাল, আপনার এসট্যাবলিশ-মেণ্টের একজন সীনিয়র অ্যাসিসট্যাণ্ট, আজ প্রায় একুশ দিন হলো ডিউটিতে টার্ন-আপ করছেন না। তাঁর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির কোন কৈফিয়ৎ আপনার জানা আছে কি?

—সেটা কি সম্ভব। একটা লোক কেন আসছেন না।

—নিশ্চয় সম্ভব। কথাটার খেই ধরে নিলেন মহাজন, কারণ আপনিই যে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন সেটা অস্বীকার করতে চাইছেন। ভবতোষবাবুর মস্তিষ্কে তড়িৎ-প্রবাহ দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন আপনার একমাত্র সহকারী।

—তার মানে! উঠে দাঁড়ালেন ডঃ মিত্তির।

—আপনার বোধহয় জানা নেই ডঃ মিত্তির, অবনীবাবুকে বোম্বেতে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা হয়েছে। এবং এই মুহূর্তে তিনি আপনার চেম্বারের বাইরে, এখানে আসার অপেক্ষায় আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল ডঃ মিত্তিরের। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। গলার টাইটা আলগা করতে করতে ধপ্ করে বসে পড়লেন। তার পরেই দেখা গেল, একদিকে মিঃ পাটোয়ারি, অন্যদিকে নিত্যানন্দ অবনী ঘোষাল ঘরে ঢুকছেন।

টপ-সিক্রেট

খবরের কাগজের এক কোণে খুব ছোট্ট করে খবরটা ছাপা হয়েছিল। উনিশশো একষট্টি সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

"যশোর রোডের বারাসতের কাছাকাছি একটি ফৌজী জীপের সহিত একটি মোটর বাইকের অকস্মাৎ সংঘর্ষে মোটর বাইকের অজ্ঞাতনামা সওয়ারি নিহত।",

এর বেশি কাগজে কিছু লেখা হয়নি। খুব ছোট্ট খবর। কারোর চোখে পড়েছিল, কারোর বা অন্যমনস্ক চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই খবরটার আগে পিছে একটা বিরাট রহস্য তলিয়ে গেছে। যেটাকে আর কোনদিনই আলোয় টেনে আনা যাবেনা।

সেদিন ঘটনাটা ঘটা মাত্রই ফৌজী জীপ থেকে অফিসাররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কিছু দূরে ছিটকে পড়া আরোহীর ওপর। কিন্তু অবস্থা দেখে থমকে গিয়েছিলেন তাঁরা। ধৈর্য হারিয়ে কেউ বা ঝুঁকে পড়েছিলেন মানুষটির ওপর। প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু জবাব পাওয়া যায়নি। জবাব দেয়ার অবস্থায় তখন মানুষটি ছিলনা। অদূরে পড়ে থাকা তালতোবড়া মোটর বাইক আর মৃতপ্রায় মানুষটিকে জীপে উঠিয়ে ফৌজী অফিসে আনতে আনতে তার কথাবলা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছিল।

মিঃ কাকের তখন সসেমীরা অবস্থা। তাঁর ওপর ওপরওলার নির্দেশ ছিল, যে ভাবেই হোক, দরকার হলে পিছন থেকে লাইট পুশ করেও মানুষটির গতি রোধ করতে হবে, এবং ফৌজী অফিসে সামিল হতে হবে। হিতে বিপরীত ঘটে যাওয়ায় যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন তিনি।

ফৌজী অফিসে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন মেজর শিবনাথন। তীব্র বেগে জীপটাকে চত্বরে ঢুকতে দেখে তিনি বেরিয়ে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। সোজা একেবারে জীপের পাশে। ততক্ষণে সকলে ধরাধরি করে লাশ আর মোটর বাইকটাকে নামাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলনা মেজর শিবনাথনের!

—করেছেন কি, একেবারে শেষ করে এনেছেন?

যেহেতু সকলের মনে একটা অপরাধ বোধ কাজ করছিল, সে কারণে কেউ

কোন জবাব দিলেন না। সকলে মিলে লাশটাকে বয়ে নিয়ে চললেন। কিছু পরে সেটিকে অফিসঘরের জমিন-সই করে ফিরে দাঁড়ালেন মিঃ কাক।

—আমরা যে ফলো করছি সেটা টের পেয়েছিল। সেই মুহূর্তে স্পীডটা টপে চড়িয়ে দিয়েছিল। যে কারণে আমাদের পুশটা এমন ফ্যাটাল হয়ে দাঁড়াল।

কৈফিয়ত যেমনি হোক, স্পষ্ট বিরক্তি মেজর শিবনাথনের মুখে। মানুষটাকে যে আর কোন ভাবেই আইডেন্টিফাই করা যাবে না। এটা একটা ক্ষতি, দারুণ ক্ষতি।

চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি! মিঃ কাকের কপালে জমে থাকা ঘাম উপছে পড়ে মাটিতে। রুমালের খোঁজে পকেটে হাত দিলেন।

সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন শিবনাথন। সকলের অপ্রস্তুত ভাব দেখে মেজাজ কিছুটা নরম হল। বললেন,—যাই হোক, দেখা যাক, এই মুহূর্তে আমরা কতটা লাভবান হয়েছি। মিঃ কাক, ভাল ভাবে তল্লাসি করে দেখুন তো বডিটা। আমার কাছে খবর আছে, উনি একজন সিক্রেট সার্ভিসের লোক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হয়ে ইনি ভারতবিরোধী গোপন নথিপত্র পাচার করতে কলকাতায় এসেছিলেন। কিম্বা আরো কোনো অন্য মতলবে।

শিবনাথনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠিনভাব দেখা দিল মিঃ কাকের মুখে। সঙ্গীদের একজনকে ইশারায় ডেকে নিয়ে নিজেই পকেট তল্লাশি শুরু করে দিলেন। কয়েকজন উদগ্রীব মানুষ্য ঘিরে দাঁড়াল সামনে পিছনে।

প্রথমেই হাতে উঠে এল একটা চাইনীজ ডটপেন। ছোটোবড়ো কিছু এলোমেলো কাগজ! দশটাকা, একশো টাকার কয়েকটা নোট। অন্য পকেটে হাত দিতেই বেরিয়ে এল একটা মাণিব্যাগ। ভারি আশ্চর্য, টাকাকড়ি বা কয়েন কিছুই সেখানে দেখা গেল না। ওপর ওপর ভাঁজ করা শুধু একটা কাগজ। পাশ থেকে ঝুঁকে পড়লেন মেজর। হাতে আঁকা সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার একটা রোড ম্যাপ।

—খবরটা তাহলে মিথ্যে ছিলনা। সত্যিকারের বাইরের মানুষ। বর্ডার ক্রশ করে চেকপোস্টের চোখে ধুলো দিয়ে ইনি কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু গোটা ম্যাপটাই তো ছোটবড় নানা বিন্দু দিয়ে ভরা। চোখের কোনে প্রশ্ন দেখা দিল শিবনাথনের, আসলে ইনি কোন্ বিন্দুর ডেস্টিনেশনে উঠেছিলেন যদি কিছু অনুমান করা যেত।

কয়েকটি মাথা আরো বেশি ঘন হয়ে ঝুঁকে পড়ল কাগজটির ওপর। সময়

এগিয়ে চলল। কারো মুখেই কোন কথা নেই। মিঃ কাকের তল্লাসি আবার শুরু হল। হিপ পকেট থেকে খুব সহজে যেটা বেরিয়ে এল, একটা বিদেশী রিভলবার। সঙ্গে আরো কিছু কাগজ। ভাল করে নজর করতে দেখা গেল তার মধ্যে কয়েকটা পেট্রল পাম্প-এর রসিদ। ডান পকেট থেকে বেরোল সিগারেট প্যাকেট, দেশলাই আর মাঝামাঝি ভাঁজ করা একটা পোস্টকার্ড। উর্দুতে লেখা একটা চিঠি। শিবনাথনের মুখে একটা অসহায় ভাব দেখা দিতেই মিঃ কাক সেটি নিয়ে নিলেন।

কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—এটি এনার মায়ের লেখা চিঠি। দেখা যাচ্ছে চিঠিটা রওয়ালপিণ্ডি থেকে লেখা হয়েছিল যশোরে! বক্তব্য, মা অনেকদিন ছেলেকে দেখেন নি। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কদিনের ছুটি নিয়ে যেতে লিখেছেন রওয়ালপিণ্ডিতে।

হুঁ।—একটা গম্ভীর থমথমে অবস্থা। কিছু পরে শিবনাথন বললেন,—কিন্তু আমি যা খুঁজছি, সে জিনিস গেল কোথায়? ইনফরমারের রিপোর্ট অনুসারে ইনিই যে সে মানুষ তাতে আমি নিঃসন্দেহ, কিন্তু—

ততক্ষণে জুতো মোজা সবই খুলে নেওয়া হয়েছে মৃতের গা থেকে। মিঃ কাক আর তাঁর সঙ্গীদের মুখে আশাভঙ্গের ছাপ বেশ প্রকট। মেজর শিবনাথনও যথেষ্ট চঞ্চল।

ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড স্যার,—অস্ফুট উচ্চারণ মিঃ কাকের: আপনি ঠিক কি চাইছেন, যদি একটু আভাস দেন। জানলে আমরা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

আপনাদের কাছে কিছুই গোপন করার কথা নয় মিঃ কাক।—শিবনাথন এবার সরাসরি চোখ রাখলেন মিঃ কাকের মুখে: আমার ভাবা ছিল, জিনিসটা হাতে এলে পর, বেশ গুছিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু—ঠিক আছে, লাশটা কোলড রুমে পাঠিয়ে দিয়ে আমার অফিসে আসুন।

পিছু ফিরলেন শিবনাথন।

আধঘণ্টা পরে শিবনাথনের অফিসঘরে আবার সবাই মুখোমুখি হলেন। এটা ওটা কথার পর শিবনাথন বললেন,—আপনারা নিশ্চয় জানেন, ওয়ার্লড পলিটিক্সে আর্ম কনট্রোল নিয়ে যতই বড় বড় কথা বলা হোক না কেন, নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবনে পশ্চিমি দেশগুলো বাজেটে মোটা টাকা বরাদ্দ করে আসছে। তার ফলে যা ঘটছে, সে সব অস্ত্র পাবার জন্য বিশ্বের অনুন্নত

দেশগুলোর মধ্যে একটা কাঙালপনা দেখা দিয়েছে। বছর চার পাঁচ আগে আমেরিকার আর্মি রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সিক্রেট সার্ভিস থেকে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, সেখানকার সেনানায়কগণ, একপ্রকার চালক বিহীন হালকা বিমান তৈরি করেছেন। যার ভেতরে টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা শত্রুপক্ষের গতিবিধির লেটেস্ট পজিশন অনায়াসে লক্ষ্য করতে পারবেন! নিঃশব্দে এই বিমান শত্রুদেশের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে, সে দেশের সৈন্য সমাবেশ সেতু ব্যবহার ও সরবরাহকেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে টাটকা ছবি চোখের সামনে তুলে ধরবে।

বলেন কি?—মিঃ কাকের গলায় বিস্ময়।

—হ্যাঁ। আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র আমেরিকা থেকে হালফিল যেসব অস্ত্র সাজ সরঞ্জাম আমদানি করছে, তার মধ্যে এই বিমান ও তার কিছু যন্ত্রাংশও আছে। কিন্তু সে সব যন্ত্রপাতি এসেমবল্ড করতে গিয়ে, সে দেশের টেকনিশিয়ানরা কিছুটা অসুবিধায় পড়েছেন! ইনস্ট্রাকশন লিটারেচার থাকা সত্বেও, বিমানটিকে কার্যকর করে তোলা সম্ভব হচ্ছেনা। আমার কাছে খবর আছে, নতুন কিছু নির্দেশিকা অন্য কোন মানুষের হাত দিয়ে সরাসরি কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। এয়ারপোর্টের কড়াকড়ি এড়িয়ে সে জিনিস পাচার করা প্রায় অসম্ভব। তাই যশোর রোড ধরে, বনগাঁর বর্ডার ক্রশ করে পূর্ব পাকিস্থান ঘুরে সে জিনিস নিয়ে যাবার দায়িত্ব ছিল ওই মানুষটির ওপর। খবর মোতাবেক সব ব্যবস্থাই নেয়া হল কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কাজের কাজ কিছুই করে ওঠা গেল না।

শেষের কথাকটি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন মেজর শিবনাথন।

দাঁড়ান, গোটা ব্যাপারটা আমায় একটু ভেবে দেখতে দিন।—চোখের কোন দুটো ছোট হয়ে এল মিঃ কাকের চিন্তায়।

—আপনি ঠিক কোন দিক দিয়ে ভাবতে চাইছেন, আমায় বললে হয়না?

সপ্রতিভ মিঃ কাক,—একি বলছেন! সেরকম কিছু নয়। আমি ভদ্রলোকের পোশাক আশাক থেকে শুরু করে সব কিছু মনে রেখে একটা ছক কাটতে শুরু করেছি। গোপনীয়তা বজায় রাখতে জিনিসটা কোথায় রাখা যেতে পারে?

—বেশ, এ বিষয়ে আপনার প্রথম ভাবনা কি বলুন।

—প্রথম শেষ বলে কিছু নেই। তবে জামা-কাপড়-জুতোর মধ্যে যে সেটা নেই, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা পাইনি বলেই যে বস্তুটি ছিল না

যা নেই, এ কথা বলি কি করে? তাহলে বলা যেতে পারে, নিরাপত্তার কথা ভেবে সেটিকে অন্য কোথাও রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোথায়?

এ প্রশ্নের উত্তর একটাই।—মেজর শিবনাথন বললেন: এমন হতে পারে যে বস্তুটি মোটর বাইকের ক্যারিয়ার বা টুল বক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিঃ কাকের,—কারেক্ট।

একলাফে চেয়ার ঠেলে বাইরে বেড়িয়ে পড়লেন তিনি। পিছনে মেজর শিবনাথন।

আধভাঙা মোটর বাইকটা নিয়ে পরীক্ষা শুরু হল। প্রথমেই তাঁরা হতাশ হলেন, মোটর বাইকটার কেরিয়ার নেই। টুল বক্স যদিও একটা আছে, কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় টুলস ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

অন্যমনস্ক শিবনাথন পায়ে পায়ে গিয়ে পৌঁছলেন কোল্ডরুমে। প্রাণহীন দেহটা নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে মেঝেতে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তের মুখভাবে কোন অনুতাপ বা অপরাধবোধ ছিল কিনা সেটাই পড়বার চেষ্টা করলেন তিনি। হঠাৎ কি মনে হল, সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। সোজা নিজের অফিস ঘরে। মৃতের পকেট থেকে পাওয়া কাগজপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। তারপর এক সময় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রায় ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

—মিঃ কাক! মনে হয় পেয়েছি। মোটর বাইকের পেট্রল ট্যাঙ্কটা একবার ভাল করে দেখুন তো?

—পেট্রল ট্যাংক। মানে?

—এই দেখুন। মানুষটি কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, ঠিক জানিনা, কিন্তু পথে ইনি দুবার পেট্রল কিনেছেন, তার ক্যাসমেমো। অথচ এই মডেলের হেভি মোটর বাইকের ফুয়েল কনজামশন কিছু বেশি বলে ফুয়েল ট্যাংক যথেষ্ট বড়ই হয়। একবার ফিলিং করলে, হান্ড্রেড কিলো মিটারের মধ্যে নতুন করে ফিলিং এর প্রয়োজন হয় না। অথচ—

ততক্ষণে কাজ শুরু হয়ে গেছে মিঃ কাকের। অভ্রান্ত অনুমান মেজর শিবনাথনের। দুজনে অবাক হয়ে দেখলেন, পেট্রল ট্যাংকটা সত্যিই বিশেষ-ভাবে তৈরি। মাঝামাঝি অংশ আলাদা টিন প্লেট দিয়ে দুভাগ করা ছিল। তারই একটি থেকে একতাড়া কাগজের বান্ডিল বেরিয়ে এল।

কিন্তু সেটির দিকে তাকিয়ে কারোর মুখে আর কথা সরল না। এ্যাকসিডেন্টের ফলে টিনপ্লেট সরে গিয়ে পেট্রলে ভিজে কাগজগুলো অপাঠ্য হয়ে পড়েছে।

হতাশ চোখে মিঃ কাক তাকিয়ে রইলেন শিবনাথনের মুখের দিকে।

মহাবীর প্রামাণিকের গল্প

মহাবীর প্রামাণিকের সঙ্গে আমার ভালই জানাশোনা ছিল। জীবনে কতরকমের পেশা যে তিনি ধরেছেন আর ছেড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শরীরের কাঠামোটা যেমন মজবুত ছিল, শক্তিও তেমন রাখতেন।

একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা, ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে হাঁটছি। উল্টোদিক থেকে এক ভদ্রলোক আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে গিয়েও থেমে পড়লেন।

—আরে সন্দীপ্ত না?

আমি সন্দীপ্ত ঠিকই। কিন্তু উনি? মাথা থেকে থুতনি জড়িয়ে দুকান ঢেকে এ্যায়সা এক ব্যান্ডেজ জড়ানো—যাতে করে ভদ্রলোককে চিনে ওঠা খুবই মুশকিল। আমি হ্যাঁ না বলার আগেই ব্যান্ডেজ মোড়া থুতনি নড়ে উঠল—আরে আমি মহাবীরদা। চিনতে পারছো না!

চোখ দুটোতে পরিচিত হাসি এবার চিকমিকিয়ে উঠল। বললুম—হ্যাঁ, এখন পারছি। তা এ দশা হল কি করে? যতদুর জানি, বক্সিং-এ আপনি মোটেই ইন্টারেসটেড ছিলেন না।

—ঠিকই জানো। তবে এটা বক্সিং এর নমুনা নয়। এ হলো জানোয়ারের সমাদর। মানে নখ দাঁত সমেত একটা মোলায়েম আলিঙ্গনের ব্যাপার আর কি।

এবার আমার চক্ষু স্থির। কিছু না বলে তাঁর মুখের দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকি। হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টায় কিছুটা সময় নেবার পর বলি—বলেন কি?

একটা উঁচুদরের হাসি ঠোঁটের ডগায় ফুটিয়ে তুললেন মহাবীর দা।

—আরে আমাকে তো জানো বয়েস থাকতে বাঁধা মাইনে আর ধরা কাজ, অর্থাৎ চাকরি আমার কোনদিনই ভাল লাগেনি। তা বলে পেটটাতো আছে, কিছু তো একটা করা চাই। চিরকাল তো আর বাবার রাজত্বে প্রজা হয়ে থাকা যায় না।

আমার জ্ঞানতঃ এটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল মহাবীরদার। ওনাদের যা অবস্থা, তাতে কয়েক পুরুষ অমন পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে

বসে কাটিয়ে যেতে পারেন। তবে ওই, চিরকালই একটু অন্য ধাঁচের মানুষ। ঘরে বসে অন্ন ধ্বংস করার স্বভাব তাঁর নয়। বরং একটু বেশি বলে, লেখা পড়ার একটা মাপাজোপা গণ্ডি পেরোবার পরবিশাল বিশ্বে অনন্য কিছু একটা করবার ধান্দা ভদ্রলোককে পেয়ে বসেছিল এক সময়ে। ফলতঃ মানুষটি কলকাতার বাঁজলি আর ট্যাপের জল ছেড়ে নিরাপত্তা নিয়েছিলেন বহুকাল। আর তারপর থেকেই উনি আমাদের অঞ্চলে একটি কিম্বদন্তী। ফিরে আসার পর কেউ বলেছিল—উনি নাকি য়ুরোপ চলে গেছিলেন। কেউ বলে— আফ্রিকা। আবার অতো দূরে যাদের মন ওঠে না, তারা বলে—উঁহুঃ। ভারতবর্ষেরই নানা অরণ্য জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি। তা সে সময়ে ওসব আমার শোনা কথা। ও ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। বিশেষ ওনার মত মানুষের সম্বন্ধে।

যতখানি সম্ভব সম্ভ্রম বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলুম—তা এখন আসছেন কোথা থেকে?

—সে কথা আর বোলোনা ভাই। জীবনে এই প্রথম মহাবীর প্রামাণিকের কথার খেলাপ হলো। ভা-রি বিচ্ছিরি লাগছে।

আমি আড় চোখে দেখলুম, মুখটা সত্যিই যেন কেমন কেমন লাগল। কিছুটা ক্লান্ত গলায় সুর টেনে বললেন—গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানায়। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইতে। ভদ্রলোক অবশ্য আমার দশা দেখে খুবই সহানুভূতি জানালেন। তবে আমি বলছি, আমি—

উত্তেজনায় থেমেগেলেন মহাবীরদা। আমার উত্তেজনা এবার তুঙ্গে।

—আসলে ব্যাপারটা ঠিক কি?

—আরে একটা রেয়ার জানোয়ার আমি চিড়িয়াখানার জন্যে ধরে এনে দেব কথা দিয়েছিলাম। তা আগে যদি জানতাম যে জানোয়ারগুলো এতদূর বেয়াদপ। আমি তাদের আনবো কি, ব্যাটারা আমাকেই পেড়ে ফেলল।

বুঝলুম, এ অল্পকথার ব্যাপার নয়। শুনতে গেলে সময় চাই। তাই মনের আগ্রহ চেপে রেখে কায়দা করে বললুম—আপনাকে কিন্তু খুব কাহিল কাহিল দেখাচ্ছে। কোথাও একটু বসলে হয়না?

—বসবে বলছো? তা বেশ তো। চলো না, ভিক্টোরিয়ার পাশে গিয়ে একটু বসা যাক।

এগিয়ে গেলুম দুজনে। বসলুম একটু নিরিবিলি দেখে। আধশোয়া

হয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে দিলেন মহাবীরদা। পরে পরেই ছাড়লেন একটা বড় মাপের দীর্ঘশ্বাস।

—অনেকগুলো টাকার ব্যাপার ছিলরে ভাই। সেসব গেল তো গেলই, ওপরথেকে ইনিসিয়াল যা খরচ করেছিলাম, তা-ও জলে গেল। সে সব পয়সা তো কেউ পেমেণ্ট করবে না।

বলে বৃত্তান্ত ফেঁদে বসলেন এবার।

মাসদশেক আগে কোন একটা বিয়ে বাড়ির মজলিসে বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন মহাবীরদা। আর ওনার যা স্বভাব, যখন যেখানে থাকেন সেখানেই একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে নেন। আলোচনার বিষয় বস্তু নানা বিচিত্রতার চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চলে। যে মানুষ নিজের কানে শোনে, সে মোহিত হয়। যে অন্যের মুখে শোনে সে নাক কোঁচকায়।

সেদিন আদিম যুগের জন্তু জানোয়ারদের সম্ভাব্য রীতিনীতি, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন মহাবীরদা। তার আগে নাকি তিনি ধারনাও করতে পারেননি যে, তেমন তেমন মহাশয় ব্যক্তিও সেখানে হাজির আছেন। বেশ গুছিয়ে বলে চলেছেন মহাবীরদা, পাখীদের বিষয়ে। প্রায় তিরিশ হাজার জাতের পাখী আছে এই পৃথিবীতে। আর সব থেকে মজা কি, এই পাখীদের আদিপুরুষ হচ্ছে স্বরীসৃপ বংশ। অর্থাৎ টিকটিকি গিরগিটি এই সব। টিকটিকি, গিরগিটি শুয়োপোকারা হল স্থলবিহারী বুকে চলা প্রাণী, আর পাখীরা হল পালক ঝোলক পরা আকাশবিহারী। সরীসৃপের রক্ত হলো ঠাণ্ডা, আর পাখীদের বেলায় ওটা বেশ গরম। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে নাকি এমনটি সম্ভব হয়েছে। আবার আদিমযুগে—বিজ্ঞানীদের মতে আর্কিওপটেরিক্স বলে এক প্রাণীর উল্লেখ আছে যাদের শরীরে স্বরীসৃপ এবং বিহঙ্গ দুরকমের লক্ষণই বর্তমান ছিল। তাদের সামনের দিকটা হতো স্বরীসৃপের মত, আর পিছনটা হতো বিহঙ্গের পুচ্ছ ঝোলান। শরীরের মাঝামাঝি অংশে দুদিকে ছিল দুই ডানা।

এতদূর জ্ঞান বিতরণের পর বলেছিলেন—আদিম যুগে সেগুলা হতো যেমন দশাশই, তেমনি শক্তিশালী। আর ঠিক তারই মিনি সংস্করণ আমি দেখলুম গতবছরে। অবিকল সেই বিশেষজ্ঞ বর্ণিত স্পেসিমেন, শুধু আকারে—

—আকারে?

— ছোট।

—আপনি দেখলেন? কিন্তু কোথায়?

সপ্রশ্ন সামনের এক ভদ্রলোক। এবার তীক্ষ্ণ হল প্রামাণিকের নজর।

—তার আগে জানতে পারি কি—মহাশয়ের কি নাম? কি করা হয়?

—নাম জেনে কি করবেন বলুন। তবে নেহাতই যদি চাপাচাপি করেন, তো বলি, কাজ আমার চিড়িয়াখানায়। পশু পক্ষী নাড়া চাড়া করেই আমার দিন কাটে।

—হুঁ। ডেজিগনেশন?

—সুপারিনটেনডেন্ট।

না, অস্বাভাবিক কোন প্রতিক্রিয়া কেউ দেখতে পায়নি মহাবীর প্রামাণিকের চোখে। আগবাড়িয়ে করমর্দন করেছিলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে। বাকি শ্রোতারা এর পর ওনাদের আলোচনার খেই বুঝতে না পেরে নিজ নিজ পথে গা ঢাকা দিয়েছিলেন।

একজন মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—যে ভাবেই হোক একটা পেয়ার এনে দিন।

আর একজন কথা দিয়েছিলেন—ঠিক আছে, আমায় কয়েকমাস সময় দিন। বার্ডসদের সীজনটা আসুক।

ক্যাবলার মত ফ্যালফেলে চোখে আমি তাকিয়ে থাকি ওনার দিকে। কানের ভেতর দিয়ে মরমে গেলেও হৃদয়ঙ্গম হয়না কোনমতেই। মহাবীরদার শক্তিশালী পেশীর কথা আমার বহুশ্রুত। তাই বলে প্রাণীজগতের ওপর এহেন পাণ্ডিত মহিমার সামনাসামনি হব, তা আমার স্বপ্নেরও বাইরে। সম্মোহিত ভাবটা তখনো কাটেনি, উনি বললেন—ওই বাদামওলার কাছ থেকে কিছু বাদাম আনোনা। ময়দানের গল্প কখনো শুধু মুখে হয়না।

দ্বিরুক্তি না করে বাদামওলার কাছ থেকে ঘুরে আসি। মহাবীরদা খোলা ছাড়িয়ে মুখে ফেলে ফিরে গেলেন পুরনো গল্পে।

—এরপর আমি কাজে লেগে গেলুম। জানোয়ার ধরবো বললেই তো আর ধরা নয়। আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই করার থাকে। যেমন ধরো, প্রথমেই আমার দরকার বেশ কয়েকটা বিস্ফোরক। যা দিয়ে জানোয়ারগুলোকে কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্ততঃ ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। তারপর চাই বেশ মজবুত খাঁচা, যার ভেতর সেগুলোকে পুরে—

বলে যেতে থাকেন উনি - সেখানে গিয়ে কিছু লোকাল লোকজন জোগাড় করে নেওয়ার প্রশ্ন আছে। যারা সব ব্যাপারে পক্ষী পাকড়ানোর কাজে সাহায্য করবে।

অতএব বার্ডসদের সীজনের অপেক্ষায় কলকাতায় বসে থাকলে চলবে না মহাবীরদার। হাতে বেশ কিছু সময় রেখে বেরিয়ে পড়লেন। ট্রেন করে গিয়ে নামলেন ঝাড়গ্রাম পেরিয়ে একটা ছোট্ট স্টেশনে। সেখান থেকে গাড়ী ধরে পার হয়ে গেলেন বিনপুরের জঙ্গল। বেলপাহাড়ীর চেক পোস্ট ফেলে যে রাস্তাটা অধুনা বিহারের সীতারামপুরের ভেতর দিয়ে আবার বাঁকুড়ায় এসে পড়েছে—সেই রাস্তা ধরে প্রায় চলে গেছিলেন বাঁশ পাহাড়ী পর্যন্ত।

সেখানে পৌঁছে তিনি ছেড়ে দিলেন গাড়ীটাকে। এখান থেকে শুরু হল পায়দল। দু একটা চাষীবাসী গ্রাম পেছনে রেখে, উপজাতীদের ঝোপড়ি এড়িয়ে এগিয়ে গেলেন পাথুরে মাটির পায়ে চলা পথে। এ সব রাস্তা পার হতে নাকি দু তিনদিন সময় লেগেছিল। আকাশমণি, দেবদারু আর ইউকেলিপটাশ এর কাঁচা সবুজ রঙের অগভীর জঙ্গলে পৌঁছে পিঠটুটা নামিয়েছিলেন তিনি। তাঁবু গাঁড়ার কোন ইচ্ছাই মনে ছিল না—নিতান্তই দু'চারদিনের বিরতি। এখন দরকার তেমন তেমন আনগোড় লোক দু'চারটে জোগাড় করে নেয়া। যাদের দিয়ে—

হ্যাঁ, পেয়েও গেছিলেন তিনি। দুটি মহালি মজুর। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তেমনই শক্ত সমর্থ, কর্মঠ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে তাদের দিয়ে বানিয়ে নিলেন বড়সড় একটা খাঁচা। নীচের লাগিয়ে নিলেন ছোট মাপের চারটে চাকা। যাতে সহজেই খাঁচাটাকে টেনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

ব্যস। উদ্যোগ পর্ব সমাপ্ত।

এরপর দিন কাটে। অধীর প্রতীক্ষার এক একটা দিন।

বলতে গেলে মহালি মজুর দুটি জংলীখানার যোগান দেয়। পাখীর মাংস আর মেটে আলু। কিম্বা শুধু বাঁশের কোঁড়া সেদ্ধ। ওরাই সব কোথা থেকে জোগাড় টোগাড় করে আনে। মহাবীরদার সেসব দিকে নজর করার সময় নেই। তার নজর তখন দূরবীনের কাঁচে। দূর বনাঞ্চলে যাকে বলে নিবদ্ধ। চলমান পাখীদের খোঁজে। কবে কখন তারা বেরিয়ে আসবে তাদের লুকানো আস্তাঁ না থেকে তার ঠিক কি?

যাই হোক, দু'একদিনের মধ্যেই দূরবীনের কাচে সর্পপক্ষীদের কলেবর নড়েচড়ে উঠল। উত্তেজনায় বড় বড় হল প্রামাণিকের চোখ। রক্তের চাপ বাড়ল শরীরে। ঘুম পাড়ানি কার্টিজগুলো বন্দুকের চেম্বারে ভরে নিয়ে শুয়ে শুয়ে এগিয়ে গেছিলেন তিনি। চোখের ইশারায় পিছু নিতে বলেছিলেন মজুর দুটোকে।

ওদিকে জানোয়ারগুলোর মেজাজ তখন বেশ খুশ খুশ। জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে নেমে এসেছে পাথুরে নদীর শীর্ণ ধারায়। ডানার ঝটাপটি দিয়ে শরীরটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চান করছে। রব তুলছে—কঁকুকঁকু, টিরাকুটিরাকু!

গুঁড়ি দিয়ে যতখানি সম্ভব কাছে গিয়ে বন্দুক ওঠালেন প্রামাণিক। বাধা দিল মহালি দুটো। তাদের চোখে তখন ভয়ের ছায়া। নুনো, বন্দুক নয়। একটাকে মারলে, বাকি গুলো পালিয়ে বাঁচবে না। ওরা যেমন মারাত্মক, তেমনই ওদের একতা বোধ। পিছু নিতে পারে।

কিন্তু খাপ্পা তখন প্রামাণিকও। তাদের মুখের দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে একটা টিলার পেছন থেকে ফায়ার করলেন পাথুরে নদীর নীল জলে। পরমুহূর্তেই শুরু হল একটা প্রাণান্তকর দাপাদাপি। উড়ে পড়ার অসফল চেষ্টা। প্রবহমান তিরতিরে জলের ওপর রাশ রাশ অবচেতনকারী ধোঁয়া, পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। বেশির ভাগই পালাল, কয়েকটা শুধু জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল জলে।

এতদূর বলার পর একটু কাশলেন মহাবীরদা! বললেন—এরপর আমি দুটো জানোয়ারকে কোনরকম সুযোগ না দিয়ে মহালি দুটোর সাহায্যে খাঁচায় পুরে ফেললাম। মহালি দুটো তো প্রথমে ছুঁতেই চায় না।

—তারপর? এবার আমার রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন।

—তারপর আর কি, ওদের দিয়ে খাঁচাটাকে টানতে টানতে প্রাণান্তকর দৌড়। যত শিগগীর পারি তল্লাট ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

একটু দম নিতে থামলেন তিনি, আর ঠিক তার পরেই মুখে দারুণ হতাশা ফুটে উঠল।

উঁচু নীচু রাস্তায় খাঁচাটাকে টানতে টানতে ছুটছেন আর ছুটছেন। কতক্ষণ তার খেয়াল নেই! হঠাৎ পেছন থেকে সেই ডাক কানে এল—কঁকু কঁক, টিরাকু টিরাকু!

পিছু ফিরে তাকালেন প্রামাণিকদা।

সর্বনাশ। বেশ কয়েকটা স্বর্পপক্ষী বীর বিক্রমে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মনস্থির করবার আগেই মহালি দুটো খাঁচা ছেড়ে ভিন্ন পথে হাওয়া এবার একা প্রামাণিক। বন্দুকটা সোজা ঘুরিয়ে ধরলেন—পর পর তাদের উদ্দেশ্যে হাওয়ায় ফায়ার করে চললেন। কিন্তু আগেরবারে জলের ওপর সেগুলো কার্যকরী হয়েছিল, এখন আর তেমনটি হলনা। দু-চারটে পিছিয়ে পড়লেও বাকিগুলোর এগিয়ে আসাকে কিছুতেই ঠেকাতে পারলেন না তিনি অতএব যঃ পলায়তি—। কিন্তু কোথায়। কয়েক কদম দূরেই ছিল একটা ঝাঁকড়া মাবড়া ছাতিম গাছ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি একেবারে তার মগডালে। কিন্তু না, তবুও তিনি তাদের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। ডানার ঝাপটা দিয়ে একটার পর একটা আক্রমণ চালায় যদিও গাছটার ডালপালা খুব বেশি বলে ব্যাটারা খুব একটা কায়দা করতে পারেনি। ডানার ঝাপটা আর নখের আঁচড়ে এই অবস্থা, নইলে তেমন তেমন ফাঁকা জায়গায় পেলে, প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে হতনা তাঁকে।

আমি বললাম—তা আপনি খালি হাতে ফিরলেন কেন? খাঁচার মধ্যে যে দুটো ছিল, সেগুলোর কি হল?

ব্যাণ্ডেজের ফাঁক দিয়ে মিয়োনো হাসি প্রকাশ পেল—।

—আর বলোনা, খাঁচাটাতো ওরা আগেই ভেঙে দিয়েছিল। সে দুটো থাকলে আজ কি আর আমায় খালি হাতে আলিপুরে আসতে হতো? তবে দেখে নিও, আমার নাম মহাবীর প্রামাণিক। সহজে কিছুতে পিছুপাও হইনা। এবার আরো আটঘাট বেঁধে যাবার চেষ্টা করছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কেন, তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? চলোনা, তাহলে তো বেশ ভালই হয়।

আমি আর কোন জবাব করিনি। ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে এসে যে যার ঘর মুখো হলুম সেদিন।

কদিন পরে খোঁজখবর করতে গিয়ে শুনি—প্রামাণিকদাকে নাকি বেশ কিছু দিন যাবত পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানিং মানসিক রোগে ভুগছিলেন বলে, ডাক্তারের পরামর্শে বাড়ীতে বন্দীদশা চলছিল কিছুকাল। একদিন দুপুরে জানলার গরাদে মাথা কুটে রড বেঁকিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছেন। তারপর আজ পর্যন্ত পাত্তা নেই।

নটবরের এক্সপেরিমেন্ট

ঝোলা ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কাঁচের জার বার করে টেবিলের ওপর রাখল নটবর। ছোট মেয়েটার সেটার ওপর চোখ পড়তেই চীৎকার করে উঠল, ওমা—দেখে যাও। বাবা কতবড় একটা টিকটিকি এনেছে।

—টিকটিকি নয়, টিকটিকি নয়। এটা হল—

কথাটা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড একটা কাশির ধমক এসে বাক্‌ রোধ করে দিল তার। সেটা আর থামতেই চায়না। ততক্ষণে গৃহিণী এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভেতর। জারের ওপর চোখ পড়তেই জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ওটা কি?

পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সামলে উঠেছে নটবর। কোন রকমে বলল, এটা হল গিরগিটি। নাম, ইগুয়ানা লিজার্ড।

—তা সে যাই হোক,ওসব পাপ বাড়ীতে কি না আনলেই নয়? যেখানকার জিনিস সেখানেই রেখে এলে পারতে।

কিছু একটা বলতে গেল নটবর, কিন্তু এমন একটা কাশির ধমক এসে হাজির হল যে, কিছুই বার হলনা মুখ দিয়ে।

—কপাল করেছি বটে! এমন একটা মানুষের পাল্লায় পড়েছি, সব কাজই শুধু অফিসে গিয়ে পোকা মাকড় ঘাঁটা। নিজে তো কাশির অসুখে ভুগছই, এবার বাড়ীর সকলকে মজিয়ে ছাড়বে!

সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

নটবরের চোখ গিয়ে পড়ল জারটার ওপর। ভারি তেজি জীবটা। মনে মনে ভাবলেন তিনি। ভাগ্যিস ডঃ ইন্দুগুপ্তর লেবরেটরীতে তার চাকরি। তাই এমন সতেজ একটা গিরগিটি যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে।

ওটাকে নিয়ে কি করবে বাবা? পুষবে?

মেয়ের মুখের দিকে তাকাল নটবর। বললেন, নারে। কাল সকালে মেরে ফেলব।

কথাটা বিশ্বাস হলনা মেয়ের। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল গিরগিটিটার কথা। পায়ে পায়ে দালান পেরিয়ে সদর ঘরে পা দিয়েই চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল তার। নটবর তখন বাঁহাতে গিরগিটিটাকে ধরে, ডান হাতের ছুরি দিয়ে সেটার চোখ কেটে বার করছিল। ভয়ে দরজার সঙ্গে

সিঁটিয়ে রইল মেয়েটি। পর পর দুটো চোখ বার করে রাখল একটা ডিসের ওপর। পাশেই রাখা ছিল এক গেলাস জল। এক চুমুক মুখে দিয়ে ট্যাবলেট গেলার মত করে চোখ দুটোকে গপ করে গিলে ফেলল।

—ও মা,—দেখে যাও! ভয়ে চীৎকার করে উঠল মেয়েটি।

সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলেন গৃহিণী। অন্ধ গিরগিটিটা তখন জারের ভেতর ছটপট করছে। নটবরের মুখে কিন্তু পরিতৃপ্তির হাসি। মেয়ের সব বর্ণনা শুনেই রি রি করে উঠল সারা গা। একটা বমির ভাব পেটের ভেতর থেকে ওপড় দিকে ঠেলে আসতেই, মুখে আঁচল চেপে ছুটলেন কলঘরে।

ঘটনাটা কানে গেল বাড়ীর লোকের। ছুটে এলেন সকলে।

—ব্যাপার কি বলতো? কি শুনছি বৌমার মুখে?

মায়ের মুখের দিকে তাকাল নটবর। কাশি চেপে কিছু একটা বলার আগেই গৃহিণী ঝাঁঝিয়ে উঠল, আসলে আপনার ছেলেকে পেত্নীতে পেয়েছে মা। আমি আজই ওনার থালা গেলাস আলাদা করে দিচ্ছি। আপনি যেন আবার রাগ করবেন না।

গৃহিণী চলে যেতে, নটবর কিছুটা বিষদ হবার চেষ্টা করল মার কাছে। কিন্তু এমনি অলপ্যেয়ে কাশি, যে তার ধমকে কিছুই বলে উঠতে পারল না। তবে এটা বুঝল, এসব কাজ প্রকাশ্যে না করাই ভাল। তাহলে আর অন্যের ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে না।

নটবরের হাবভাব, চলাফেরার বদল হল। গৃহিণী কিন্তু সেটাকে মোটেই ভাল চোখে দেখল না। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে মানুষটা কেমন যেন থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের ভেতর চওবও করে। কতকটা ঠিক গিরগিটির মত। গিরগিটিটার চোখ গিলে মানুষটার স্বভাব বদলে গেল?

মনের যখন এমনি অবস্থা, তখন আর এক কাণ্ড করে বসল নটবর। বাজার থেকে ফিরে মাছের ছোট ব্যাগটা নিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল কলঘরে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও হাজির হল সেখানে। দেখে' একটা জ্যান্ত রুইমাছকে মুড়োর দিক থেকে গিলে খাবার চেষ্টা করছে নটবর।

—একি! একি! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

অপ্রস্তুত নটবর। তবু থেমে পড়েনি। আরো কয়েক মিনিট মাছটাকে মুখের মধ্যে রেখে ফেলে দিল মাটিতে।

কাঠ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল গৃহিণী। নটবর কলঘর থেকে বেরিয়ে

যাবার পর মনে হল, এসব কথা লোক জানাজানি করে লাভ নেই। যদিও এখন আধপাগল, বাধা পেলে হয়তো পুরো পাগল হয়ে যাবে।

কয়েকটা দিন চুপচাপ গেল। অফিস থেকে ফিরে নটবর তার কাশি আর ঘরের কাগজ নিয়েই থাকে। একদিন সন্ধ্যে বেলা একটা জল ভর্তি চার কেজির ঘি এর টিন হাতে বাড়ি ফিরল। সদর ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখতেই, মেয়ে জিজ্ঞেস করল, ওটাতে কি বাবা?

—ব্যাঙ।

—ব্যাঙ!

তড়াক করে লাফ দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল সে। কয়েকটা হোঁতকা ব্যাঙ সত্যি সত্যিই তার চোখে পড়ল ভেতরে। বলল, ওগুলোকে নিয়ে কি করবে?

বাসের ধকল পুইয়ে এত কৈফিয়ত ভাল লাগছিল না নটবরের। বলল, গান শুনব!

—গা-ন! গান তো বর্ষায় গায়। এত শীতে মুখ খুলবে?

—তাতে তোমার কি মা?

চুপ করে গেল মেয়ে। খবরটা কিন্তু তুলে দিল মায়ের কানে।

সে রাত্রে আর দুচোখের পাতা এক হলনা গৃহিণীর। সকাল হলেই সদর ঘরের জানালায় গিয়ে চোখ দিলেন। আর তারপরেই সমস্ত দেহটা থর থর করে কেঁপে উঠল। লজ্জায় ঘৃণায় কোন কথাই বার হলনা মুখ দিয়ে।

নটবরের তখন কোন দিকে খেয়াল নেই। সে তখন একটা ব্যাঙের অর্দ্ধেকটা মুখের ভেতর নিয়ে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরেছে। রীতিমত কাহিল অবস্থা ব্যাঙটার। পরিত্রানের আশায় পিছনের পা দুটো যেন সাইকেল চালাচ্ছে। চোখ দুটো গোলগোল হয়ে উঠেছেনটবরের। সেটার সামাল দিতে। চকিতে গৃহিণীর কি মনে হল। ভেতর বার দুটো দরজায় শিকল তুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, পাগল! বদ্ধ পাগল' উঃ!

সেই চীৎকারে অনেকেই ছুটে এসে উঁকি দিল ঘরের ভেতর। অভাবিত দৃশ্য সবাই বুঝল, পাগল হবার যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু পূরণ হয়ে গেছে। এ মানুষকে আর কিছুতেই ঘরের বার হতে দেয়া যায় না।

পর পর কয়েকদিন অফিস কামাই। চারদিনের দিন ডঃ ইন্দ্রগুপ্ত নিজেই এসে হাজির হলেন নটবরের বাড়ী, ব্যাপারটা কি? এক কাশি ছাড়া ওর তো কোন অসুখ শুনিনি কখনো?

—মাথার গণ্ডগোল। মনে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে।

—মানে।

অবাক হলেন ডঃ গুপ্ত। তার পর সব শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ওসব কিছু নয়। মনে হচ্ছে আমার লাইব্রেরী থেকে "দেশ বিদেশের টোটকা" বইটা পড়েই এসব ভূত ওর মাথায় চেপেছে।

—টোটকা!

—হ্যাঁ টোটকা। নটবর গৃহিণীর মুখের দিকে তাকালেন ডঃ গুপ্ত,—আগেকার দিনে, যখন এত ওষুধের আবিস্কার হয়নি, সে সময় কাশির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নানা দেশে এই রকম সব টোটকার ব্যবহার ছিল। নিজের ওপর সেগুলোকেই একস্পেরিমেন্ট করছিল নটবর।

—কি রকম?

—ওই গিরগিটির ব্যাপারটাই ধরো। দক্ষিণ আমেরিকায় ইগুয়ানা লিজার্ড নামে এক জাতের গিরগিটি পাওয়া যেত। সেগুলোর চোখে থাকতো প্রচুর পরিমাণে হিস্টামিন প্রতিরোধক পদার্থ। এলার্জি জনিত কাশি হলে, সেখানকার মানুষ এই প্রজাতির চোখ দুটোকে গিলে খেত।

হাসলেন ডঃ গুপ্ত। সবার চোখ তার মুখের ওপর দেখে বললেন, আমাদের ভারতবর্ষেও ওসব ছিল। কাশি হলে, মানুষ সদ্যধরা মাছের মুড়োটা মিনিট দু'তিন মুখের ভেতর রেখে দিত। কেননা, চেপে চুপে ধরলে, মাছের মুখ দিয়ে যে রস বার হয়, সেটি হল, অ্যামোনিয়া ক্লোরাইড।

—আর ব্যাঙ? ব্যাঙেও নিশ্চয় কিছু আছে?

—নিশ্চয়। নটবরের ছোট মেয়েটির দিকে তাকাকেন ডঃ গুপ্ত। ব্যাঙের লালার মধ্যে আছে সোডিয়াম সাইট্রেট। ইংল্যাণ্ডের চেসায়ার অঞ্চলের মানুষ কাশি সারাতে ভোরবেলা একটা করে আস্ত ব্যাঙ মুখের ভেতর নিয়ে বসে থাকতো কিছুক্ষণ। আজকের দিনে যে সব কাশির ওষুধ তৈরি হয়, তার অধিকাংশই সোডিয়াম সাইট্রেট, অ্যামোনিয়া ক্লোরাইড বা হিস্টামিন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি।

—তাহলেই বলুন, আজকের দিনে এগুলোকে মুখে নেয়াটা পাগলামি নয়?

নটবর গৃহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডঃ গুপ্ত বললেন, পাগলামি ঠিক নয়। হয়তো বাজারের ওষুধে ফল না পেয়ে, সরাসরি এগুলোকে এ্যাপ্লাই করতে শুরু করেছিল নটবর। আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে চলুন দেখি কথা বলে।